শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত

মূল্য দুই টাকা

প্রকাশক

বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স্ লিমিটেড্

স্বত্বাধিকারী—আশুতোষ লাইব্রেরী

৫, বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

৯০, হিউয়েট রোড, এলাহাবাদ

৭৮।৬, লায়েল ষ্ট্রীট্, ঢাকা

প্রথম সংস্করণ : ১৩৫২

দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৩৫৩

তৃতীয় সংস্করণ : ১৩৫৬

মুদ্রাকর

শ্রীভবেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ প্রেস

১, কর্নওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা

কল্যাণীয়

শ্রীমান সত্যেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা

ও

শ্রীমান বিশ্বনাথ দাশগুপ্তকে

স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ

সমর্পণ করলাম।

শ্রীদেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত
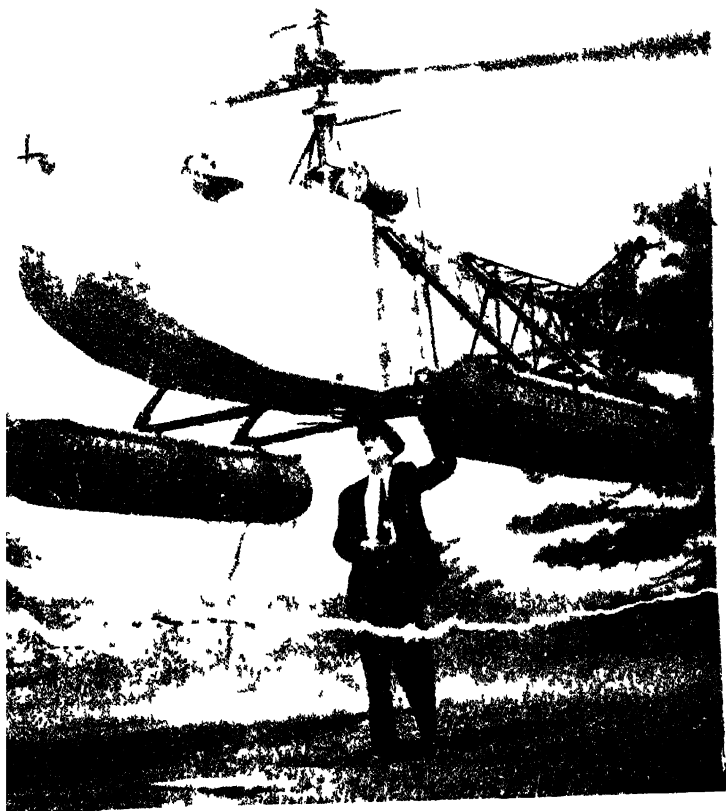
> “আকাশের ঘন নীল
> লাগাল কি অঞ্জন, চোখে মোর”—

উনিশশ’ সাঁইত্রিশ সালের চৌদ্দই জুলাই।

ক্যালিফোর্নিয়ার বিস্মিত বিমুগ্ধ জনগণ সেদিন তিনজন রুশীয় বিমান চালককে সাদরে অভ্যর্থনা করল। এই বিমান চালকেরা একটানা বাষট্টি ঘণ্টা উড়ে, মস্কো থেকে ক্যালি-ফোর্নিয়ায় এসেছেন। তাঁরা পথ অতিক্রম করেছেন ৬,৭০০ মাইল। এর আগে এত দীর্ঘপথ কোন বৈমানিকই একটানা অতিক্রম করতে পারেন নি। রুশীয় বৈমানিকেরা যে কোন বিশেষ রকম লোক দেখানোর মনোভাব নিয়ে এই দুঃসাহসিক কাজে নেমেছিলেন তা’ নয়, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল পরখ্ ক’রে দেখা এই পথে মস্কো থেকে ক্যালিফোর্নিয়া পর্য্যন্ত বিমান চলাচল করা যায় কিনা, এবং রুশীয় গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় ছিল আমেরিকার সঙ্গে মেরুপ্রদেশের উপর দিয়ে বিমান-পথে যোগাযোগ স্থাপন করা। এই ঐতিহাসিক বিমান-চালনা

সেদিন যুগান্তকারী ব'লে জগৎ স্বীকার করেছিল; কিন্তু একথাও সবাই নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেছিল যে, এইখানেই এর শেষ নয়। বিমানের উন্নতির যে শেষ কোথায় সে কথা বলা অসম্ভব।

তবু আজকের এই যুগান্তকারী ভূপ্রদক্ষিণের পিছনে কত যুগের সাধনা এবং অধ্যাবসায় রয়ে গেছে মানুষের আকাশে উড়বার প্রচেষ্টা আজকের নয়—বহু শতাব্দী আগের। যেদিন মানুষ দেখেছে পাখী কেমন অবলীলাক্রমে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে এবং এ বিষয়ে তার অক্ষমতা দারুণ, সেদিন থেকেই তার মনে সংকল্প জেগেছে—সে আকাশ জয় করবে।

গ্রীস দেশের পৌরাণিক বিবরণীতে প্রথম আকাশে উড়বার কথা দেখা যায়। আমাদের দেশের রামায়ণেও অবশ্য পুষ্পক-রথের উল্লেখ আছে। কিন্তু কি ক'রে যে সেই রথ আকাশে উড়ত তার কিছুমাত্র বিবরণ পাওয়া যায় না।

ঐতিহাসিক গেলিয়াস লিখে গেছেন যে, খৃষ্ট জন্মাবার প্রায় চারশ' বছর আগে একজন গ্রীক বৈজ্ঞানিক একটি উড়বার যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। বিমানখানা দেখতে ছিল একটা পায়রার মত, কাঠের তৈরী এবং উড়ত যন্ত্রের জোরে। বহু সম্ভ্রান্ত গ্রীক নাগরিক এই কাঠের পায়রা দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। গেলিয়াস অবশ্য এই পায়রা-বিমানের যন্ত্রের কথা বলেছিলেন; কিন্তু সে যন্ত্র কি রকম এবং উড়বার কৌশলই বা কি সে কথার কিছুমাত্র উল্লেখ করেন নি।

শোনা যায় নীরোর রাজত্বকালে রোমের এক ব্যক্তি যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে উড়েছিলেন এবং নামবার সময়ে প'ড়ে গিয়ে মারা যান। কিন্তু এসব পৌরাণিক কথা প্রায় পুষ্পক রথেরই সমান।

আকাশে যে ওড়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে প্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চিন্তা করেন ইংরাজ দার্শনিক রোজার বেকন। অথচ উড়বার ইতিহাসে ইংরাজের দান অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর! বেলুনের সম্ভাব্যতা প্রথম বেকনেরই মাথায় আসে। তিনি বলেছিলেন খুব পাতলা তামার পাত দিয়ে বড় একটা গোলা তৈরী ক'রে তার ভিতরে আগুন পুরতে হবে। তারপর সেই গোলাটা যদি কোন পাহাড়ের চূড়া থেকে ছেড়ে দেওয়া যায়. তবে সে শূন্যেই ভাসতে থাকবে। কিন্তু বেকন একথা ভাবেন নি যে, অত পাতলা তামার বেলুন বাতাসের চাপে চুমড়ে চুরমার হয়ে যাবে।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যাবে প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস এবং বিজ্ঞানে বহুবার সংঘাত লেগেছে। গ্যালেলিওর আবিষ্কার ধর্ম্মবিশ্বাসে আঘাত করেছিল ব'লে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। গ্যালেলিওর অনেক আগে হলেও বেকনের ভাগ্যেও তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এই ধরণেরই পুরস্কার জুটেছিল। ধর্ম্মযাজকেরা বললেন, বেকন শয়তানের সঙ্গে কারবার করছেন; অতএব তাঁকে শাস্তি দেওয়া হোক। সঙ্গে সঙ্গে পোপ তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা বন্ধ ক'রে দিলেন। শুধু তাই নয়,

তাঁর গতি-বিধির উপরেও বিধি-নিষেধ আরোপ ক'রে তবে তাঁরা নিশ্চিন্ত হলেন।

কিন্তু এর কিছুদিন পর থেকেই কালের হাওয়া একটু একটু ক'রে অন্য দিকে বইতে সুরু করল। উড়বার কথা মানুষ নতুন ক'রে চিন্তা করতে লাগল। শিশুদের ছোটবেলা থেকেই শিক্ষা দিলে তা'রা ভবিষ্যতে উড়তে পারে কিনা তা' নিয়েও পরীক্ষা চলতে লাগল।

বেকনের পরে এলেন যোহান মূলার—একজন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক। শোনা যায় তিনি নাকি একটা কলের ঈগলপাখী তৈরী করেছিলেন। তবে একথা কতদূর সত্য তা আজ আর জানা যায় না।

বেকনের পরে সত্যিকারের বৈজ্ঞানিকের মত এই সমস্যা সমাধান করবার চেষ্টা করেছিলেন লিওনার্ডো ডা-ভিন্সি, পঞ্চদশ শতাব্দীতে। তিনি ছিলেন একাধারে বৈজ্ঞানিক, চিত্রকর এবং দার্শনিক। তাঁর সমস্ত কাজেই তিনি অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। বিমান বিষয়েও তিনি অনেক কিছুই আবিষ্কার ক'রে গেছেন। তার ভিতরে অন্ততঃ দুটি জিনিষ তাঁর নাম চিরস্মরণীয় ক'রে রাখবে। আমরা জানি এরোপ্লেনের সামনে যে পাখা ঘুরতে থাকে তারই জন্য এরোপ্লেন সামনের দিকে ছুটে চলে। এই পাখার উদ্ভাবক লিওনার্ডো। তাঁর দ্বিতীয় আবিষ্কার হেলিকপ্‌টার-প্লেনের মূলতথ্য। সাধারণ এরোপ্লেন মাটির উপর দিয়ে অনেকটা পথ ছুটে গিয়ে তবে

আকাশে উড়তে পারে। কিন্তু হেলিকপ্‌টার পাখীর মত সোজা যে কোন জায়গা থেকে যেমন উঠতে পারে, তেমনি নামতেও পারে যে কোন জায়গায়। হেলিকপ্‌টারের মূলকথা তিনি আবিষ্কার ক'রে গেছেন কত দিন আগে, কিন্তু আজও এর যথেষ্ট উন্নতি হ'ল না। অথচ কত বিরাট সম্ভাবনাই না এর রয়েছে।

লিওনার্ডো কতগুলো ছোট ছোট মডেল হেলিকপ্‌টার তৈরী করেছিলেন এবং তারা উড়েও ছিল। কিন্তু কোন বড় যন্ত্র তিনি তৈরী করতে পারেন নি, শুধু প্ল্যান ক'রে রেখেছিলেন মাত্র। বড় আকাশ-যান তৈরী না করবার একটা প্রধান কারণ হ'ল প্রোপেলার চালাবার ভাল ইঞ্জিনই তখন আবিষ্কৃত হয় নি।

লিওনার্ডোর একটা অদ্ভুত ধারণা ছিল যে, বড় বড় ডানা হাতের সঙ্গে বেঁধে মানুষও পাখীর মত অনায়াসে আকাশে উড়তে পারে। পাখীর দেহ অত্যন্ত হালকা। আমাদের দেহ যে পরিনাণে ভারী তাতে উড়তে হলে অন্ততঃ তেরো-চৌদ্দ হাত লম্বা পাখা দরকার। অথচ অতবড় পাখা নাড়তে যে পরিমাণ শক্তি দরকার তার দশভাগের একভাগ শক্তিও আমাদের আছে কিনা সন্দেহ।

লিওনার্ডোর পরে আর একজন বৈজ্ঞানিকের কথা মনে পড়ে। তিনি হলেন ফ্রান্‌সিস্‌কো-ডি-লানা, সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। বেকনের মত তিনিও একটা তামার বেলুন তৈরী

করবার কথা ভেবেছিলেন। খুব পাতলা তামার পাত দিয়ে বিশ ফুট ব্যাসের একটা তামার গোলা তৈরী করতে হবে। তিনিও বেকনের মত বাতাসের সাংঘাতিক চাপের কথা ভাবেন নি।

কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক তাঁর কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেন নি। তার একটা অদ্ভুত কারণ ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, একবার আকাশ-যান তৈরী হলে মানুষ তাকে যুদ্ধের কাজে লাগাবেই। অতএব এ চেষ্টা না করাই ভাল। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর বিবরণীতেও লিখে গেছেন। তিনি লিখেছেন, "মানুষ যেন কোনদিন আকাশ-যান তৈরী করিতে না পারে। ঈশ্বর না করুন, মানুষ যদি কোনদিন এই কাজে সফল হইতে পারে তাহা হইলে সমস্ত মনুষ্য জাতির যে কি বিপদ হইবে তাহা ভাবিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। স্থলে, জলে, অন্তরীক্ষে—কোন স্থানেই নিরাপত্তা বলিয়া কিছু থাকিবে না। গভীর নিশীথে সুপ্ত নগরীর উপর শত শত আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবে, অতল সমুদ্রের বুকে জাহাজের উপর আকাশ হইতে অসংখ্য সৈন্য লাফাইয়া পড়িবে। মানুষের এত বড় বিপদ্ ভগবান কিছুতেই হইতে দিবেন না। এত বড় চরম দুর্ভাগ্যের ইতিহাস মানুষের ললাটে লিখিয়া দিবেন, বিধাতা কখনই এতটা নিষ্ঠুর নহেন!"

সেদিনকার বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করলেও আকাশে উড়তে পারতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু যে কারণে তিনি সে চেষ্টাই

করলেন না তা'স্তে ভাববার অনেক কিছুই আছে। আজ বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের একটা সুস্পষ্ট প্রশ্নের নিশ্চিত জবাব দেবার দিন এসেছে—ইতিহাসের পর্ব্বে পর্ব্বে এত যে আত্ম-হননকারী আবিষ্কারের ধারা বয়ে চলেছে এর শেষ কোথায় ?

—২—

"শূন্যে ব্যোম অপরিমাণ
মদ্যসম করিতে পান
মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ, ঊর্দ্ধ নীলাকাশে—"

এতদিন পর্য্যন্ত কেবল গবেষণা এবং চেষ্টাই চলেছে। আকাশে ওড়া সত্যি সত্যি সম্ভব হ'ল অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে দু'জন ফরাসী বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায়। তাঁরা ছিলেন দুই ভাই—যোসেফ মঁগোলফীয়ে এবং এটিনে মঁগোলফীয়ে।

মঁগোলফীয়েদের বাবা ছিলেন এক কাগজের কলের মালিক এবং তাতে তিনি যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করতেন। তাঁর ন'টি সন্তানের সবারই বিজ্ঞানের দিকে বেশ ঝোঁক ছিল। যোসেফ ছোটবেলা থেকেই নানা রকম জিনিস আবিষ্কার করতে চেষ্টা করতেন। বড় হয়ে কলেজে ঢুকলেন, কিন্তু সেখানে ফল বেশী ভাল হ'ল না। কলেজ ছাড়বার পরে তিনি বাপের ব্যবসায়ে যোগ দিলেন ; কিন্তু সেখানেও তাঁর সুবিধা হ'ল না। আগেই

বলেছি ছোটবেলা থেকেই তাঁর মাথায় নানাও রকম আবিষ্কারের মতলব ঘুরত। তিনি বাপের মিলে সেই সব পরীক্ষা করতে লাগলেন। ফলে পিতার সঙ্গে তাঁর মনান্তর ঘটে এবং তিনি সেই মিল ছেড়ে দিয়ে ভরর্ঁতে এসে নিজে এক মিল বসালেন। এবারে তাঁর নিজেরই কল হ'ল। তাই মনের আনন্দে তিনি নানা রকম পরীক্ষা চালাতে লাগলেন। কিন্তু তাতে ফল হ'ল এই যে—অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি অত্যন্ত দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং কিছুদিনের মত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা একেবারেই ছেড়ে দিতে হ'ল। এরপর বিবাহ ক'রে তাঁর আর্থিক অবস্থা অনেকটা ফিরে যায় এবং তখন থেকেই তিনি নিশ্চিন্তমনে কাজ আরম্ভ করেন।

এদিকে ছোট ভাই এটিনে স্থপতি-বিদ্যা শিখতে গেলেন; কিছুদিন স্বাধীনভাবে কাজও করেছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই নিজেদের মিলের কাজে লেগে যান।

এই হ'ল দু' ভাইএর মোটামুটি ইতিহাস। দু'জনেরই বাল্য-কাল থেকে নানা রকম পরীক্ষা করবার বাতিক ছিল। ছোট-বেলাই তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে, উনুন বা চিমনী যে কোন জায়গার ধোঁয়াই উপরে উঠে যায়।

একবার উনুনের ধোঁয়ার উপরে একটা কাগজের ঠোঙা ধ'রে রাখলেন। গরম ধোঁয়ায় ঠোঙাটি ভর্ত্তি হয়ে গেল। তখন ছেড়ে দিতে ঠোঙাটি লাফ দিয়ে একেবারে ঘরের মাথায় গিয়ে উঠল। দু' ভাই ত অবাক্। তাঁরা দেখলেন আকাশেও

মঁগোলফীয়ের বেলুন পৃঃ ১০

হয়ত এই রকম ভাবে ওঠা যেতে পারে। কিন্তু এ নিয়ে বেশীদূর পরীক্ষা করবার আগে তাঁরা প্যারাসুট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যোসেফ সাত ফুট ব্যাসের ছাতার মত একটা প্যারাসুট তৈরী ক'রে তার তলায় একটা বাস্কেট ঝুলিয়ে দিলেন। তারপর ঐ বাস্কেটের ভিতরে একটা ভেড়া বসিয়ে দিয়ে উঁচু এভিনন টাওয়ার থেকে ফেলে দিলেন। নিজেও একবার একটা প্যারাসুটে ক'রে এক বাড়ীর ছাত থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন। সে হ'ল ১৭৭৯ সালের কথা। যোসেফের বয়স তখন উনচল্লিশ, এটিনের চৌত্রিশ।

একদিন যোসেফ দেখলেন উনুনের খানিকটা উপরেই একটা সার্ট ঝুলছে। গরম ধোঁয়া ওর ভিতরে ঢুকছে আর সার্টটা বার বার ফুলে' ফুলে' উঠছে। এই দেখেই তাঁর মনে বেলুন তৈরীর কল্পনা জাগে। প্রথমে দু'ভাই মিলে নানা রকম সাইজের কাগজের বেলুন তৈরী ক'রে পরীক্ষা করতে লাগলেন। পরে বড় বড় বেলুন নিয়ে খোলা জায়গায় পরীক্ষা করতে সুরু করলেন এবং সে পরীক্ষাও সফল হ'ল। শেষে ১৭৮৩ সালের জুন মাসে তাঁরা ঠিক করলেন যে, এবারে তাঁদের সাধনার ফলাফল জনসাধারণকে নির্ভয়ে জানানো যেতে পারে।

ফ্রান্সের ছোট একটি সহর এনোনে। ১৭৮৩ সালের ৫ই জুন। বেশ গরম প'ড়ে গেছে। ছোট সহরটিতে আজ কর্ম্মচাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে এসেছে। সবাই অলস মধ্যাহ্নে সহরের বড় মাঠের দিকে চলেছে। ক্রমে ক্রমে বিস্তর লোক মাঠে জড়ো হ'ল।

মাঝখানে কাপড়ের তৈরী বিরাট একটা গোলা। তলায় একটা লোহার ঝুড়ি বাঁধা, তার ভিতরে স্তিমিত আগুন ধূমায়িত। উল এবং খড় সেই আগুনের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল। গল-গল ক'রে ধোঁয়া উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে গোলাটা ফুলে উঠল।

চারিদিক নিস্তব্ধ। হঠাৎ সেই স্তব্ধ জনতা চঞ্চল হয়ে উঠল। বেলুন উপরে উঠছে! অগণিত লোক রুদ্ধনিশ্বাসে দেখতে লাগল কেমন ক'রে সেই বেলুন একটু একটু ক'রে উপরে উঠে ক্রমে শূন্যে মিলিয়ে গেল।

বেলুনটি সাত হাজার ফুট পর্য্যন্ত উপরে উঠেছিল। তারপর দশ মিনিট পরে যেখান থেকে উঠেছিল তার থেকে দেড় মাইল দূরে মাটিতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বেলুনটির ওজন ছিল প্রায় সাত মণ এবং তার আরও সাতমণ ভারী জিনিস টেনে তুলবার ক্ষমতা ছিল।

দাবানলের মত এই খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সব দেশেই সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা আরম্ভ হয়ে গেল।

সেই বছরেই আগষ্ট মাসে প্যারিসের এ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস্ একটা বেলুন তৈরী করতে মনস্থ করলেন। মঁগোল-ফীয়েদের ধারণা ছিল—ধোঁয়ার জোরেই শুধু বেলুন ওড়ে এবং সে ধোঁয়াও উল এবং খড়ের হওয়া চাই। আসলে কথা হ'ল, আগুনের তাপে বাতাস গরম হয়। গরম বাতাস ঠাণ্ডা বাতাসের চাইতে হাল্‌কা। ধোঁয়ার ভিতরে গরম বাতাস থাকে ব'লেই

বেলুন উপরে উঠে। ততদিনে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক ক্যাভেণ্ডিস্ হাইড্রোজেন গ্যাস আবিষ্কার করেছেন। সাধারণ বাতাস এই গ্যাসের চাইতে প্রায় চৌদ্দগুণ ভারী, তাই এ্যাকাডেমি অব সায়েন্সস্ ঠিক করলেন যে, তাঁদের বেলুন হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে ভর্ত্তি করতে হবে। বেলুনের খোল তৈরীর ভার পড়ল রবার্টদের উপরে, আর হাইড্রোজেন গ্যাস দিয়ে বেলুনটি ভর্ত্তি করবার ভার পড়ল চার্ল্‌স্ নামে একজন পদার্থবিদের উপরে।

২৭শে আগষ্ট ভোর থেকেই অজস্র লোক প্যারিসের ক্যাম্পডি মার্‌স্‌এ সমবেত হতে আরম্ভ করল। একটা বিরাট গাড়ীতে ক'রে বেলুনটিকে সেখানে নেওয়া হ'ল। সঙ্গে অগণিত লোক আর বন্দুকধারী সেপাই। অসংখ্য মশাল, ব্যাণ্ড বাদ্যসহ সেই বিরাট প্রোসেসন মাঠের মাঝখানে এসে থামল। এত বড় শোভাযাত্রা নাকি প্যারিসে বহুকালের মধ্যে দেখা যায় নি। একটার সময় প্রবল বারিবর্ষণ আরম্ভ হ'ল। কিন্তু একটি লোকও নিজের জায়গা থেকে নড়ল না। পাঁচটার সময়ে বেলুনটাকে ছাড়া হ'ল। দেখতে দেখতে দু'মিনিটের ভিতরেই সে মেঘের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে বেলুনটি পনের মাইল দূরে এক গ্রামের ভিতরে মাঠের উপরে গিয়ে পড়ল। বেলুনটা বাতাসের দোলায় নানা রকম অঙ্গভঙ্গী ক'রে দুলতে লাগল। এই দেখে কৃষকেরা তো ভীষণ ভীত হয়ে পড়ল। পরে তাদের ভিতর দু'একজন সাহস ক'রে এগিয়ে গিয়ে ওর গায়ে গুলি ছোড়ে। গ্যাস বেরিয়ে যাওয়ায়

বেলুনটাও চুপসে গেল। তখন তা'রা ওটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করতে লাগল।

ক্রমেই বেলুন সম্বন্ধে নানা রকম অদ্ভুত গল্প চারদিকে প্রচারিত হ'তে লাগল। তার ফলে লোকের মনে এমন একটা আতঙ্ক সৃষ্টি হ'ল যে, গভর্ণমেণ্টকে বাধ্য হয়ে একটি ঘোষণাবাণী প্রচার করতে হ'ল। সরকারপক্ষ থেকে প্রচার করা হ'ল যে, এখন থেকে যখনই আকাশে চাঁদের মত গোলাকার কিছু দেখা যাবে তখন লোকে যেন ভয় না পায়। এতে ভয় পাবার কিছু নেই, কারণ এ হ'ল মানুষেরই তৈরী আকাশে ওড়বার একরকম অভিনব কৌশল, মানুষেরই উপকারের জন্য তৈরী।

সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রান্সের রাজা-রাণীর সামনে এক বেলুন ওড়ান হ'ল। এর সঙ্গে একটা ঝুড়ি জুড়ে দিয়ে তার ভিতরে একটা মুরগী, একটা হাঁস এবং একটা ভেড়া চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রাণিজগতে এরাই প্রথম আকাশযাত্রী, কোন মানুষ নয়। বেলুনটি প্রায় দেড় হাজার ফুট উপরে উঠেছিল এবং কিছুক্ষণ পরে নির্ব্বিঘ্নে নেমে আসে।

হাঁস-মুরগীকে আকাশ-ভ্রমণ ক'রে নির্ব্বিঘ্নে ফিরে আসতে দেখে ডি-রোজিয়ার নামে একজন ফরাসী ভদ্রলোক ঠিক করলেন তিনিও আকাশে উঠবেন। চুয়াত্তর ফুট উঁচু আর আটচল্লিশ ফুট চওড়া একটা বেলুন তৈরী হ'ল। বেলুনটির ওজন হ'ল প্রায় বিশ মণ। সমস্ত আয়োজন করতেই নভেম্বর

মাসের অর্দ্ধেক কেটে গেল। অবশেষে এল ২১শে নভেম্বর —বেলুন ছাড়বার দিন। রোজিয়ার এবং মারকুইস্ অব আরলেণ্ডিস্ বেলুনে উঠলেন। বেলুনটি ছিল মঁগোলফীয়ে বেলুনের ধরণে তৈরী, তলায় একটি অগ্নিকুণ্ড ঝোলান। কিছুদূর উঠেই বেলুনের একদিকে আগুন লেগে যায়। মারকুইস্ মশায়ের তো ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি বারবার বেলুন নীচে নামাবার জন্য তাগিদ দিতে লাগলেন। কিন্তু রোজিয়ার সে কথায় কান দিলেন না। তিনি আগে যেকেই বুদ্ধি ক'রে খানিকটা জল এবং একটা স্পঞ্জ নিয়ে এসেছিলেন। তাই দিয়ে কোনমতে আগুন নিভিয়ে ফেললেন। একটু পরেই বেলুন নীচে নামতে লাগল। আশঙ্কা হ'ল হয়ত কোন বাড়ীর ছাদে গিয়ে পড়বে। রোজিয়ার আগুনটাকে উস্কে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেলুন সাঁ সাঁ ক'রে উপরে উঠে গেল।

এই ঘটনার প্রায় মাসখানেক পরে চার্লস এবং রবার্ট তাঁদের হাইড্রোজেন-ভর্ত্তি বেলুনে চ'ড়ে আকাশে ওঠেন। পৌনে দু' ঘণ্টা উড়বার পর বেলুনটা হঠাৎ প্রবলবেগে নীচের দিকে নামতে থাকে। মাটি ছোঁবার পরে রবার্ট বেলুন থেকে নেমে গেলেন; রইলেন শুধু চার্লস্। ওজন কমে যাওয়ায় বেলুন আবার উপরে উঠে গেল। এবারে বেলুনটি সাড়ে দশ হাজার ফুটের উপরে উঠল। মাটির কাছে তাপ ছিল ৪৭° ডিগ্রি; উপরে উঠবার পর তাপমান যন্ত্রে দেখা গেল তাপ মাত্র ২১° ডিগ্রিতে এসে দাঁড়িয়েছে। চার্লসের সমস্ত দেহ কি একরকম

অস্বস্তিকর অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। মনে হতে লাগল কে যেন ভারী একটা হাতুড়ী দিয়ে মাথার ভিতরে অনবরত পিটছে। বাতাস অত্যন্ত পাতলা। শ্বাস নেবার জন্য রীতিমত হাঁপাতে হয়। এদিকে চারদিকের বাতাস পাতলা হয়ে যাওয়ায় ভিতরের হাইড্রোজেন গ্যাস ফুলে' উঠতে লাগল। বেলুন ছিঁড়ে যায় আর কি! শেষে চার্লস্ বাধ্য হয়েই খানিকটা গ্যাস ছেড়ে দিলেন। বেলুনও ধীরে ধীরে নেমে এল। চার্লসের এই অভিযানে একটা নতুন অভিজ্ঞতা হ'ল। আকাশ-ভ্রমণ যতটা আরামপ্রদ হবে ব'লে লোকে আশা করেছিল; দেখা গেল আসলে সে ততটা আরামপ্রদ নয়।

ইংলণ্ডের আকাশে প্রথমে বেলুন ওড়ে ১৭৮৩ সালের নভেম্বর মাসে। এই বেলুনে কোন ইংরাজ ওঠেন নি, উঠেছিলেন একজন ইতালীয় কাউন্ট—ফ্রান্সিস্‌কো টংসাম বেকারী।

আকাশে উড়বার ইতিহাসে ইংলিশ চ্যানেলের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। এই চ্যানেল পার হওয়া নিয়ে বহুবার বহু প্রতিযোগিতা হয়ে গেছে। কিন্তু একটা আশ্চার্য্যের বিষয় হ'ল এই যে, এই সব প্রতিযোগিতায় যাঁরা পুরস্কার ঘোষণা করেছেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ইংরাজ এবং যাঁরা এই সব পুরস্কার পেয়েছেন তাঁদের ভিতরে ইংরাজ আছেন অল্পই।

একজন ফরাসী ভদ্রলোক জঁ৷ ব্লাঁকার্ড এবং একজন আমেরিকান চিকিৎসক ডক্টর যেফ্‌রিজ্‌ প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হন। এই যাত্রার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছিলেন

আমেরিকান ভদ্রলোকটি। ১৭৮৫ সালের ৭ই জানুয়ারী বেলা একটার সময় তাঁরা ডোভার বন্দর থেকে রওনা হলেন। হাওয়ার অবস্থা গোড়া থেকেই অত্যন্ত প্রতিকূল ছিল। প্রতি মুহূর্ত্তটি আশঙ্কার ভিতর দিয়ে কাটাতে হয়েছে, কখন বেলুন সমুদ্রের উপর গিয়ে পড়ে। ভার কমাবার জন্য ভারী ভারী সব জিনিসই ফেলে দিতে হ'ল। ব্লাঁকার্ড প্রথমে তাঁর ভারী কোটটা ফেলে দিলেন। দেখাদেখি যেফ্রিজ্‌কেও কোট ফেলে দিতে হ'ল। কোটের পরে গেল প্যাণ্ট। আরোহিদ্বয় শুধু অন্তর্বাস প'রে রইলেন। বেলুনের পথ নির্দ্দেশ করবার যত যন্ত্রপাতি সব একে একে ফেলে দেওয়া হ'ল। বেলুন আর বাগ মানে না। অবশেষে তাঁরা ফরাসী উপকূলে এসে পৌঁছলেন। নীচে ঘন বন। বেলুন ধীরে ধীরে নামতে লাগল। ডক্টর যেফ্রিজ্‌ একটা গাছের ডাল ধ'রে ফেললেন। না হ'লে বেলুন যে কোথায় গিয়ে নামত কে জানে?

ডি-রোজিয়ার প্রথম বেলুনে চ'ড়ে আকাশে উঠেছিলেন। আবার বেলুনে চড়তে গিয়ে প্রাণও দিয়েছেন তিনিই প্রথম। ব্লাঁকার্ড ইংলিশ চ্যানেল নির্ব্বিঘ্নে পার হয়েছেন শুনে তিনিও সংকল্প করলেন যে, ইংলিশ চ্যানেল পার হবেন। এই কাজের জন্য তিনি জোড়া বেলুন তৈরী করলেন, একটা হাইড্রোজেন গ্যাসে ভর্ত্তি আর দ্বিতীয়টি মঁগোলফীয়ে ধরণের—সঙ্গে একটা অগ্নিকুণ্ড বাঁধা। তিনি একজন সহকারী নিয়ে এই কাজে নামলেন। বেলুন বেশ সহজভাবেই তিন হাজার ফুট পর্য্যন্ত

উঠল। আকাশ বেশ পরিষ্কার, কোথাও মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। বাতাসের বেগও খুব বেশী নয়। সব দিক দিয়েই অবস্থা বেশ অনুকূল। কিন্তু হঠাৎ আগুনের কুণ্ড থেকে একটা ফুলকি গিয়ে পড়ল হাইড্রোজেন ভর্ত্তি বেলুনের উপর। অমনি দপ্ ক'রে সমস্ত বেলুনটাতেই আগুন ধ'রে গেল। তখন আর কিছু করবার ছিল না। এই আগুনেই রোজিয়াকে প্রাণ দিতে হ'ল।

ফরাসীরা বেলুন আবিষ্কার করেছিলেন। বেলুনকে যুদ্ধের কাজেও লাগালেন তাঁরাই প্রথম। অষ্টাদশ শতকের তিরানব্বই সালে ক্যাপটেন কুটেল প্যারিসের কাছে আকাশবাহী এক সৈন্যদল গঠন করলেন। পরের বছর ফ্লুরাসের যুদ্ধে তিনি শত্রুর সৈন্যবল পরিদর্শন করবার জন্য বেলুনে ক'রে শত্রুর দেশের উপর উড়ে গিয়েছিলেন। অস্ট্রিয়ানরা প্রথমে বেলুন দেখে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন বুঝতে পারল মাথার উপরে ওটা একটা বেলুন—আর কিছু নয়, তখন বেলুন লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুড়তে আরম্ভ করল। ক্যাপটেনও ব্যাপার দেখে তাড়াতাড়ি বেলুনটিকে উপরে তুলে ফেললেন। তিনি পূরো দু' ঘণ্টা পর্য্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং এরই সহায়তায় ফরাসীরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন।

তারপরে আকাশজয়ের অভিযানে বহুদিন আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নি। ১৮৩৬ সালে একজন ইংরাজ বৈমানিক চার্লস্ গ্রীনের তত্ত্বাবধানে বিরাট এক বেলুন তৈরী হ'ল। লণ্ডন গ্যাস কোম্পানী কোল গ্যাস দিয়ে বেলুনটিকে

ভর্ত্তি ক'রে দিলেন বিনা খরচায়। তবে এতে তাদেরও লাভ হ'ল। এই উপলক্ষে কোম্পানীর যথেষ্ট বিজ্ঞাপনের কাজ হয়ে গেল। বেলুনটা উঁচু ছিল আশি ফুট এবং এর ঘের ছিল দেড়শ' ফুটেরও বেশী। ষাট মণেরও বেশী মাল বইবার ক্ষমতা ছিল এই বেলুনটির। ঠিক হ'ল নভেম্বর মাসের সাত তারিখে বেলুন ছাড়া হবে। যাত্রী হবেন চার্লস্ গ্রীন এবং তাঁর দু'জন সহকারী।

আগে থাকতেই দরকারী জিনিসপত্র বেলুনের ঝোলায় তোলা হ'ল। নানা রকমের যন্ত্রপাতি, পনেরো দিনের মত রসদ, ব্যারোমিটার, টেলিস্কোপ, হরেক রকমের ফ্লাস্ক, মদের বোতল এই সব ঝুড়ি বোঝাই ক'রে তোলা হ'ল। যা যা দরকার মনে হয়েছে তার কিছুই বাদ দেওয়া হয় নি।

এবারে যাত্রা করতে হবে। মাঠের মাঝখানে বিরাট জনতা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। দেড়টার সময় বেলুন ছাড়া হ'ল। বেলা পাঁচটার ভিতরেই বেলুন ফরাসী রাজ্যের উপর উপস্থিত হ'ল। পরের দিন বেলা সাড়ে সাতটার সময়ে জার্ম্মানীর ভীলবার্গের কাছে বেলুন এসে নামল। দেখতে দেখতে চারদিকে জার্ম্মান কৃষকেরা এসে ভীড় ক'রে দাঁড়াল। তাদের চোখে সন্দেহ এবং বিস্ময়। গ্রীন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা জার্ম্মান ভাষায় নিজেদের অবস্থা বুঝিয়ে দিলেন। তখন কৃষকেরা খুব সমাদর করতে লাগল। কি রকম ভাবে এই বৈমানিকদের একটু সাহায্য করবে এইজন্য তাদের ভিতর কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেল।

গ্রীনের কতকগুলো অদ্ভুত বাতিক ছিল। আকাশে উড়বার সময়েও তিনি নানা রকম মজা করতেন। একবার একটা ঘোড়া নিয়ে আকাশে উঠেছিলেন। যতক্ষণ উপরে ছিলেন, ঐ ঘোড়ার উপরেই ব'সে ছিলেন! একবার একটা বাঘ নিয়ে বেলুনে উঠতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের অনুমতি পান নি ব'লেই এই ইচ্ছা সফল করতে পারেন নি।

এই ঐতিহাসিক অভিযানের প্রায় চার বছর পরে তিনি বেলুনে ক'রে আটলান্টিক পার হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন ; কিন্তু উপযুক্ত সহায় এবং উৎসাহের অভাবে সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয় নি। শেষজীবন পর্য্যন্ত এই ক্ষোভ তাঁর মনে ছিল।

আরও তিন বছর পরে অর্থাৎ ১৮৪৩ সালে জন্ ওয়াইজ নামে একজন আমেরিকান আটলান্টিক পার হবার মতলব করেন। তাঁর ধারণা ছিল খানিকটা উঁচুতে আকাশে এমন একটা স্তর আছে যেখানে সর্ব্বদাই পশ্চিম থেকে পূবের দিকে হাওয়া বইছে। এই হাওয়ার জোরেই তিনি আমেরিকা থেকে ইউরোপে আসতে পারবেন, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। সংকল্প সিদ্ধির জন্য অর্থ এবং সহায় দুইই প্রয়োজন। জন্ দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ালেন। অবশেষে ত্রিশ বছর পরে তিনি সেই সাহায্য পেলেন। বেলুন তৈরী হ'ল। যাত্রার দিন ঠিক হয়েছে। সব ঠিকঠাক। এমন সময়ে একদিন তার মুরুব্বিদের সঙ্গে ওয়াইজের ঝগড়া হয়ে গেল। ফলে ওয়াইজ আর গেলেন না। তাঁর বদলে গেল অন্য লোক। কিন্তু অদৃষ্টের এমনই

মর্ম্মান্তিক পরিহাস, চল্লিশ মাইল পথ যেতে না যেতে বেলুনটি ধ্বংস হয়ে যায়!

এযাত্রা অবশ্য ওয়াইজ বেঁচে গেলেন। কিন্তু এর ছ'বছর পরে সমুদ্রের উপর উড়তে গিয়ে তাঁর সলিল-সমাধি ঘটে।

—৩—

"আমরা যাব যেথায় কোন
যায় নি নেয়ে সাহস করি"—

সাধারণ বেলুনের মস্ত বড় একটা অসুবিধা হ'ল, তাকে ইচ্ছামত চালনা করা যায় না; তাকে প্রায় সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করতে হয় বাতাসের গতির উপরে। হাওয়ার বিরুদ্ধে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। এই অসুবিধার জন্য বিস্তর বৈমানিক প্রাণ হারিয়েছেন। কি ক'রে বেলুনকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তে আনা যায় সে বিষয়ে বৈমানিকেরা গোড়া থেকেই সচেতন ছিলেন। অবশেষে অনেক দিনের সাধনার পর সফল হলেন একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক, হেনরী জিফার্ড ১৮৫২ সালে।

জিফার্ড ছিলেন একজন ইঞ্জিনীয়ার, নানা রকম ষ্টীম-ইঞ্জিন নিয়ে কাজ করতেন। তিনি একটা বড় বেলুন তৈরী করলেন, দেখতে অনেকটা চুরুটের মত—লম্বা একশ' চুয়াল্লিশ ফুট এবং ব্যাস চল্লিশ ফুট। এর তলায় এরোপ্লেনের মত প্রোপেলার বসান হ'ল। প্রোপেলার চলবে ষ্টীম-ইঞ্জিনের জোরে। যে

সব বেলুন সম্পূর্ণরূপে ইচ্ছামত চালান যায় তাদের নাম দেওয়া হ'ল এয়ার সিপ। জিফার্ড প্যারিস থেকে ট্র্যাপ্‌স্‌ পর্য্যন্ত এয়ার সিপ চালিয়ে সবাইকে বিস্মিত ক'রে দিলেন।

কয়েক বছর পরে জিফার্ড আরও একটা এয়ার সিপ তৈরী রেছিলেন ; কিন্তু প্রথমবার উড়তে গিয়েই সেটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। জিফার্ড এবং তাঁর সঙ্গীরা আশ্চর্য্য রকমে রক্ষা পেয়ে যান। কিন্তু এই দুর্ঘটনায় লোকের মনে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হ'ল। এয়ার সিপ যে কোনদিন নিরাপদ আকাশ-যান হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে সে বিশ্বাস আর কারু রইল না। জিফার্ড হাল ছাড়লেন না। তিনি কিছুদিন পরে আরও বড় একটা এয়ার সিপ তৈরী করবার প্ল্যান করলেন। লম্বায় সেটি হবে প্রায় দু'হাজার ফুট এবং প্রস্থে প্রায় একশ'। কিন্তু এ পরিকল্পনা তিনি কার্য্যে পরিণত করতে পারেন নি।

অনেক দিনের মধ্যে যে এয়ার সিপের বিশেষ উন্নতি হয় নি তার মস্ত বড় একটা কারণ হ'ল ষ্টীম-ইঞ্জিনের সাংঘাতিক ওজন। তখনকার দিনে পেট্রোল-ইঞ্জিনের আবিষ্কার হয় নি। এদিকে ষ্টীম-ইঞ্জিন যেমন ভারী তেমনি জরদ্গব। জার্ম্মানরা কিন্তু এয়ার সিপের বিরাট সম্ভাবনার কথা গোড়াতেই বুঝতে পেরেছিল। তারা এর উন্নতি করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। অবশেষে ১৯০০ সালে একজন জার্ম্মান কাউণ্ট ফন্‌ জেপ্‌লিন এক নতুন ধরণের এয়ার সিপ আবিষ্কার করেন। তাঁর নিজের নাম অনুসারেই এই ধরণের এয়ার সিপের নামকরণ

৭ .

পা।ব প,

করা হ'ল জেপ্‌লিন্। এ্যালুমিনিয়ামের ফ্রেমের উপর সিল্ক এবং সাটিন কাপড়ের আবরণ দিয়ে মোড়া হ'ল ; তা ছাড়া, আকাশে ভাসিয়ে রাখবার জন্য এই খোলের ভিতরে স্তরে স্তরে সাজিয়ে রাখা হ'ল গ্যাস ভর্ত্তি থলি। এটা লম্বায় ছিল চারশ' কুড়ি ফুট এবং প্রস্থে আটত্রিশ ফুট। ষোল-অশ্বশক্তি ছুটি ইঞ্জিন বসান হ'ল একে চালাবার জন্য।

প্রথম জেপ্‌লিন ঘণ্টায় বিশ মাইল পর্য্যন্ত যেতে পারত। তবে হাওয়া অনুকূল থাকলে গতি আরও কিছু বেড়ে যেত। কিছুদিনের মধ্যে কাউণ্ট আর একটি জেপ্‌লিন তৈরী করবেন ব'লে মনস্থ করলেন। কিন্তু কতকগুলো আকস্মিক বিপদ্‌পাতে তাঁর এই চেষ্টা সফল হয় নি। তার পরে প্রায় ছ' বছর তিনি আর বিশেষ কোনও চেষ্টা করেন নি। শেষে ১৯০৬ সালে তিনি তৃতীয় জেপ্‌লিন তৈরীর কাজে হাত দিলেন। এই সব কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হ'ত। কাউণ্ট তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য প্রায় নিঃস্ব হতে বসেছিলেন। কিন্তু অবশেষে তাঁর সাধনার পুরস্কার মিলল। তাঁর তৃতীয় জেপ্‌লিনের কাজ দেখে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। জার্ম্মান সম্রাট্ কাইজার খুশি হয়ে তাঁর সহায় এবং পৃষ্ঠপোষক হলেন।

গত মহাযুদ্ধের সময় জেপ্‌লিনের প্রভূত উন্নতি সাধন করা হয়েছে। এয়ার সিপ এবং জেপ্‌লিন যে কত বড় সম্পদ সেকথা যুদ্ধের দিনে বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

আদিমকাল থেকেই অজানাকে জানবার জন্য মানুষের একটা

প্রবল চেষ্টা ছিল। এরই প্রেরণায় মানুষ জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে, পাহাড় ডিঙ্গিয়েছে, সাগর পার হয়েছে। আফ্রিকার হিংস্রপ্রাণি-সমাকুল অরণ্যের ভিতরে সে দুঃসাহসিকের মত প্রবেশ করেছে। হিমালয়ের তুষাররাজ্য জয় করতে গিয়ে কত লোক প্রাণ দিয়েছে। উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু বরফের দেশ। সেই চিরতুষারাবৃত রহস্যময় দেশের আকর্ষণে কত লোক ঘরের মায়া ছেড়ে পথে বার হয়েছে। বেলুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অজানা দেশ আবিষ্কারের নতুন একটা পথ খুলে গেল।

তখন ১৮৯৭ সাল। জুলাই মাস। চারদিকে গরম প'ড়ে গেছে। সলোমন এ্যান্‌ড্রি দু'জন সঙ্গী নিয়ে বেলুনে চ'ড়ে উত্তর মেরুর রহস্য সন্ধানে বার হলেন। তাঁরা রওনা হলেন স্পিট্‌স্‌বার্গেন থেকে, সঙ্গে নানা রকমের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কিছুদিনের মত রসদ আর কয়েকটা সংবাদবাহী পায়রা। যাত্রার পর কয়েকদিনের মধ্যে, তাঁদের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। অবশেষে এগার দিন পরে স্পিট্‌স্‌বার্গেনের কাছেই একটা সংবাদবাহী পায়রা উড়ে এল। সে যে সংবাদ বহন ক'রে এনেছে তার মর্ম্ম হ'ল—"চারদিকে ভীষণ ঠাণ্ডা। তা'হলেও অবস্থা ভালই। এই নিয়ে তিনবার আমরা পায়রা ছেড়েছি।" কিন্তু এই খবরই শেষ খবর। তারপর কতদিন চ'লে গেল! দিনের পর দিন সবাই তাঁদের খবর জানবার জন্য উৎসুক হয়ে ছিল। সেই সংবাদ শেষকালে এল; একদিন পরে নয়, দু'দিন পরে নয়—তেত্রিশ বছর পরে!

১৯৩০ সালে নরওয়ে দেশ থেকে উত্তর মেরু আবিষ্কারের জন্য এক অভিযান সুরু হয়। এই অভিযাত্রিগণ স্পিট্‌স্‌বার্গেন এবং ফ্রান্‌জ্‌ যোসেফল্যাণ্ডের মাঝামাঝি হোয়াইট আইল্যাণ্ডে সেই হতভাগ্য বেলুনচারীদের কঙ্কাল আবিষ্কার করেন। বরফের স্তূপের মধ্যে তাঁহাদের দেহ আপনিই সমাহিত হয়ে গিয়েছিল। তবে তাঁদের সঙ্গে যে সব লেখা কাগজপত্র ছিল তা কিন্তু কালের অত্যাচারে নষ্ট হয় নি! তাঁরা লিখেছেন কেমন ক'রে তাঁদের মেরু-ঝড়ের মুখে পড়তে হয়েছিল। চারদিক থেকে হিমশীতল বাতাস বইতে সুরু করল। দেখতে দেখতে সমস্ত বেলুন এবং বেলুন-বিহারী ঝড়ের আবর্ত্তে প'ড়ে দুলতে লাগল। ঝরা পাতার মত বরফ পড়তে লাগল। দূরে বড় বড় তুষারস্তূপ ভেঙ্গে পড়ছে। চারদিক থেকে তুহিন-মৃত্যু তার শত শত বরফের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বেলুন একটু একটু ক'রে নামচে—দু'শ ফুট, একশ' ফুট নীচে—আরও নীচে—

তারপরে আর কিছু লেখা নেই। কাগজের উপরে কালির হরপে না লেখা থাকলেও দেহের কঙ্কালকে সাক্ষী রেখে তাঁরা তাঁদের শেষ ইতিহাসে লিখে রেখে গেছেন।

মানুষ শুধু যে উড়বার যন্ত্রই আবিষ্কার করেছে এমন নয়। আকাশ থেকে প'ড়ে গেলেও যাতে নির্ব্বিঘ্নে মাটিতে এসে নামতে পারে তারও উপায় বার করেছে। সে হ'ল প্যারাসুট। প্যারাসুট জন্মলাভ করেছে বেলুনের অনেক আগে।

প্যারাসুটের কথা প্রথম চিন্তা করেন লিওনার্ডো ডা-ভিন্সি।

মঁগোলফীয়ে ভ্রাতৃদ্বয়ও বেলুন আবিষ্কারের আগে প্যারাসুট তৈরী করেছেন। যাঁরা প্যারাসুট ব্যবহার ক'রে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন তাঁদের ভিতরে এণ্ড্রী যাক্স্ গারনারিনের নামই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তিনি অল্প বয়স থেকেই প্যারাসুট ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছেন। উনিশ শতকের একেবারে গোড়ার দিকে তিনি তাঁর প্যারাসুটের কৌশল দেখাবার জন্য লণ্ডনে যান। একদিন সন্ধ্যার সময়ে তিনি প্যারাসুট নিয়ে বেলুনে ওঠেন। তখন প্রবল বাতাস বইছিল। কিন্তু তাইতেই হ'ল বিপদ। প্যারাসুটে ক'রে লাফ দিয়ে পড়বার সময়ে তিনি বাতাসে অনেকদূর ভেসে যান। শেষে পড়লেন এসে এক মাঠের উপর। প্রবল হাওয়া তাঁকে মাটির উপর দুরন্ত বেগে আছড়ে ফেলল। সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। টলতে টলতে যখন তিনি উঠে দাঁড়ালেন তখন আর তাঁর চলবার ক্ষমতা ছিল না।

আজকাল প্যারাসুটের কত রকম উন্নতি করা হয়েছে! সে সব কথা আমরা পরে বলব।

—৪—

"অনেক কাল তো হয়ে গেল, অনেক লোকের মেলা,
এত দিন তো চলল শুধু ফানুষ নিয়ে খেলা—"

১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর।

নানা কাজের ভীড়ে মানুষ এই দিনটিকে ভুলে গেছে। যাদের বা মনে আছে তা'রাও একে প্রকৃত-মর্য্যাদা দেয় না।

আজকাল ঘণ্টার প্বর ঘণ্টা মানুষ আকাশে উড়ছে, হাজার হাজার মাইল পথ একটানা পাড়ি দিচ্ছে! কত লোক এরোপ্লেনে ক'রে মেরুসন্ধানে বেরিয়েছে। আমরা খবরের কাগজে এই সব বিবরণ পড়ি আর বিস্মিত হই। কিন্তু এর সব কিছুর সূচনাতেই রয়েছে এই খ্যাতিহীন দিনটি—১৭ই ডিসেম্বর, ১৯০৩ সাল। এই দিনটিতে আমেরিকাবাসী দুই ভাই, অরভিল এবং উইলবার রাইট প্রথম এরোপ্লেনে ক'রে আকাশে ওঠেন।

সেদিনটা ছিল ঘোলাটে। ভোরবেলা থেকেই কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে সুরু করেছিল। ক্রমে ক্রমে বাতাসের বেগ বাড়তে লাগল। সেই প্রবল হাওয়ার মধ্যেই রাইট-ভ্রাতৃদ্বয় তাঁদের এরোপ্লেন নিয়ে এলেন কিটিহকের মাঠে। প্রথম এরোপ্লেন আকাশে উড়বে, এই দেখবার জন্য রাইটেরা আশেপাশের সবাইকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু আমন্ত্রিতেরা ভেবেছিল এ এক রকমের তামাসা। তাই এই ঐতিহাসিক ঘটনা দেখবার জন্য সেদিন পাঁচজনের বেশী লোক জোটে নি!

আকাশে উঠবার সময়ে প্রথমেই যাতে প্লেনটিকে একটা ধাক্কা দিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য তাকে কাঠের রেলের উপর বসানো হ'ল। বাতাস ততক্ষণে প্রায় ঝড়ের আকার ধারণ করেছে। কে আগে উঠবেন এই নিয়ে ভাগ্য-পরীক্ষা করা হ'ল। ছোট ভাই অরভিল জিতলেন।

অরভিল এরোপ্লেন ছাড়লেন। বাতাসের ঘূর্ণির ভিতরে প্লেন অশান্তভাবে দুলতে লাগল। প্রথম বারেই এরোপ্লেন

চালনা সফল হ'ল। অরভিল উড়েছিলেন মাত্র বারো সেকেণ্ড, পথ অতিক্রম করেছিলেন একশ' কুড়ি ফুট। তা'হোক, তবু বাতাসের চাইতে ভারী মেসিন আকাশে উঠল তো?

অরভিলের পরে উইলবার চেষ্টা করলেন। তিনি অনেকক্ষণ বেশী আকাশে ছিলেন—উনষাট্ সেকেণ্ড! পথ অতিক্রম করেছিলেন আটশ' বারো ফুট।

সেদিনকার ওই সাফল্য, হয়ত এখন অকিঞ্চিৎকর মনে হবে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? ১৯৩৭ সালের রুশীয় বৈমানিক-দের একটানা বাষট্টি ঘণ্টা আকাশ-বিহারের চাইতে সেদিনকার সেই উনষাট সেকেণ্ডের মর্য্যাদা কিছুমাত্র কম নয়। অরভিল এবং উইলবার, দুজনেই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী। উইলবার জন্মগ্রহণ করেন ইণ্ডিয়ানার অন্তর্গত মিলভিলে ১৮৬৭ সালে এবং অরভিলের জন্ম হয় ওহিও প্রদেশের ডেটন নগরীতে। অরভিল উইলবারের চাইতে বছর চারেকের ছোট।

ছোটবেলা থেকেই দু'ভাইয়ের বিজ্ঞানের প্রতি ঝোঁক দেখা যায়। শুধু তাই নয়, প্রকৃত বৈজ্ঞানিক হতে হলে যেসব গুণের প্রয়োজন তাও তাঁদের ছিল। পর্য্যবেক্ষণ, অধ্যবসায় এইই ছিল তাঁদের সব চাইতে বড় গুণ যার জোরে তাঁরা এত বড় হতে পেরেছিলেন।

আকাশে কি ক'রে ওড়া যায় এ প্রশ্ন তাঁদের মাথায় বহুবার এসেছে। ছোটবেলা থেকে এ সম্বন্ধে ভেবেছেনও যথেষ্ট। কিন্তু তাঁরা প্রাণপণ ক'রে কাজে লাগলেন যখন উইলবারের বয়স

উনত্রিশ এবং অরভিলের পঁচিশ। মাত্র সতেরো বছর বয়সে অরভিল একখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বার করেন। কাগজেব নাম দিলেন 'ওয়েষ্ট সাইড্ নিউজ্'। সম্পাদকীয় লেখা থেকে আরম্ভ ক'রে কম্পোজ করা, ছাপা পর্য্যন্ত সবই তিনি একা করতেন। কিন্তু একা একা চালানো যখন আর কিছুতেই সম্ভব হ'ল না তখন তিনি তাঁর বড় ভাইকে ডাকলেন সাহায্য করবার জন্য। তারপর দু'জনে মিলে আরও দু'খানা কাগজ বার করেছিলেন, একখানা সান্ধ্য কাগজ আর একখানা সাপ্তাহিক কাগজ। কিন্তু কাগজ তাঁদের ভাল চলল না।

তখন বাইসাইকেলের নতুন প্রচলন হয়েছে। দু'ভাই কাগজ ছেড়ে দিয়ে সাইকেলের কারখানা খুললেন। অধ্যবসায় এবং বুদ্ধির জোরে অল্পদিনের ভিতরই তাঁদের ব্যবসা বেশ জেঁকে উঠল। তাঁদের আবিষ্কারের শক্তি এবং প্রতিভা ছিল, কিন্তু এতদিন কোন্ নির্দ্দিষ্ট পথে তাঁরা তাঁদের প্রতিভাকে নিয়োজিত করবেন তা' ঠিক করতে পারছিলেন না। অবশেষে যখন এক মর্ম্মান্তুদ দুর্ঘটনায় জার্ম্মান বৈমানিক লিলিয়েন্থাল মারা যান তখনই তাঁদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা একেবারে সুনির্দ্দিষ্ট হয়ে যায়। অটো লিলিয়েন্থাল ছিলেন একজন জার্ম্মান ইঞ্জিনিয়ার। তিনি গ্লাইডার যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে উড়ে সমস্ত পৃথিবীকে বিস্মিত করেছিলেন।

গ্লাইডার হ'ল ইঞ্জিন-বিহীন ডানাওয়ালা একরকম আকাশ-যান—দেখতে অনেকটা এরোপ্লেনেরই মত। একবার আকাশ-

ভ্রমণ করতে গিয়ে লিলিয়েন্থাল মারা যান্। এই দুর্ঘটনা থেকেই রাইট-ভাইএরা ঠিক করলেন যেমন ক'রেই হোক আকাশে উড়বার জন্য নতুন ধরণের গ্লাইডার তৈরী করতে হবে। লিলিয়েন্থাল যে গ্লাইডার তৈরী করেছিলেন তা' নিয়ে স্পোর্টস্ হিসাবে আকাশে ওড়া চলতে পারে, কিন্তু তা দিয়ে নির্ব্বিঘ্নে আকাশে ওড়ার কাজ কখনই চলতে পারে না। তার মস্ত বড় একটা কারণ হ'ল লিলিয়েন্থাল আকাশে ব'সে নিজের ব্যালান্স বজায় রাখতেন নানা রকম অঙ্গভঙ্গী ক'রে। এই খানেই হ'ল আসল গলদ। কিন্তু গলদ কোথায় বুঝতে পেরেও রাইট-ভাইএরা অমনিই গ্লাইডার তৈরীর কাজে হাত দিলেন না। তাঁরা প্রথমে আকাশ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পড়শুনা আরম্ভ করলেন। যেখানে যে বই পেয়েছেন তাই পড়েছেন, যেখানে যে তথ্য পেয়েছেন তাই অক্লান্ত পরিশ্রমে সংগ্রহ করেছেন, পড়েছেন ও আলোচনা করেছেন। ক্যালি, মাক্সিম্, পিলচার, ল্যাংলি, এ্যাডার, লিলিয়েন্থাল প্রভৃতি যার যত বই ছিল সব তন্নতন্ন ক'রে দেখেছেন। কোন কিছু সিদ্ধান্ত কববার আগে দু'ভাইয়ে মিলে অনেকক্ষণ আলোচনা করতেন। দু'জন দু'পক্ষ হয়ে দাঁড়াতেন। অরভিল একরকম যুক্তি দেখাতেন, উইলবার তাই খণ্ডন করতেন। আবার উইলবার এক কথা বলতেন, অরভিল তার উল্টোটি প্রমাণ করতে চাইতেন। এই রকম তর্ক-আলোচনার সন্ধানী আলো ফেলে তাঁরা সবরকম প্রচলিত তথ্যই বিশ্লেষণ ক'রে দেখলেন। কিন্তু কি দেখলেন? দেখলেন অধিকাংশ তথ্যই

ভুল। তাঁদের সব চাইতে শ্রদ্ধা ছিল জার্ম্মান বৈমানিক লিলিয়েন্থালের উপর। যখন দেখলেন যে, তাঁর মতবাদও অধিকাংশই ভুল, তখন তাঁরা যেন অনেকটা হতাশ হয়ে পড়লেন। তাঁদের ধারণা হ'ল, মানুষ ভারী মেসিনে ক'রে উড়তে একদিন পারবেই, তা তাঁরা হয়ত দেখে যেতে পারবেন না, কিন্তু হাল তাঁরা ছাড়লেন না।

তাঁদের সামনে সব চাইতে বড় সমস্যা হ'ল কি ক'রে যন্ত্রের সাহায্যে গ্লাইডারকে আকাশে ব্যালান্স করা যায়। সব রকম পড়াশুনা ক'রে এবারে তাঁরা কাজে নামলেন। গ্লাইডারের পিছনের দিকে তাঁরা ছোট ছোট ডানা বসালেন এবং এমন ব্যবস্থা করলেন যাতে চালক অনায়াসে ওগুলো ইচ্ছামত নাড়াতে পারেন। এদের নাম হ'ল এলিভেটর ; এদের সাহায্যে ইচ্ছামত উঁচু বা নীচু ক'রে গ্লাইডারকে উঠানো নামানো যায়। দিক ঠিক করবার জন্য পিছনে রইল হাল—রাডার। যাতে গ্লাইডারকে ইচ্ছামত একাত-ওকাত করা যায় তার জন্য বড় ডানা দুটির সঙ্গে দুটি ছোট উপ-ডানা জুড়ে দেওয়া হ'ল। এদের নাম হ'ল এলরন্‌স্ ; চালক দড়ি বা তারের সাহায্যে এদের নাড়তে পারেন। এলরন্‌স্ এবং এলিভেটরই বিমান-বিজ্ঞানে যুগান্তর এনেছে।

গ্লাইডার তৈরী হয়ে গেল। তারপর এল একে পরীক্ষা করবার পালা। কিটিহক মাঠে নিয়ে গিয়ে দেখা গেল তাঁদের প্রথম চেষ্টাই আশাতীত রকমে সফল হয়েছে। এর পরে বাকী

রইল শুধু গ্লাইডারেব সাথে প্রোপেলার-ইঞ্জিন জুড়ে দেওয়া। পেট্রোল-ইঞ্জিন অবশ্য তখন আবিষ্কার হয়েছে। কিন্তু তাদের ওজন ছিল বড় বেশী। তাই প্রোপেলার চালাবার জন্য তাঁদের দরকারমত ইঞ্জিনও তৈরী ক'রে নিতে হ'ল।

তারপর এল সেই স্মরণীয় দিন—১৯০৩ সালের ১৭ই ডিসেম্বর। রাইট ভাতৃদ্বয় তাঁদের এরোপ্লেনে চেপে—তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'রাইট ফ্লাইয়ার'—আকাশে উড়লেন!

উত্তর ক্যারোলিনার কিটিহক প্রান্তরে সেদিন কি ঘটেছিল অনেকদিন পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ সে সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। কিছু কিছু গুজব বাইরে ছড়িয়েছিল বটে, কিন্তু চাঁদের দেশে যাওয়া আজ যেমন আমরা অসম্ভব মনে করি, কোন ভারী মেশিনে ক'রে আকাশে উড়ে যেতে পারে একথাও সেদিনকার লোক ঠিক তেমনি ক'রে অবিশ্বাস করেছিল। কিছুদিন পরে রাইট-ভ্রাতৃদ্বয় ঠিক করলেন বড় দেখে একটা প্লেন তৈরী করবেন এবং তার পরীক্ষা হবে কিটিহকে নয়—ডেটনের কাছাকাছি হফ্‌ম্যান প্রান্তরে।

তাঁদের এতদিনের সাধনার ফলাফল সবাইকে দেখবার জন্য তাঁরা পঞ্চাশজন খবরের কাগজের রিপোর্টারকে নিমন্ত্রণ করেন। শুধুমাত্র কৌতূহলের বশবর্ত্তী হয়েই রিপোর্টারেরা এলেন। কিন্তু এইখানে বিধাতা রাইটদের সঙ্গে সামান্য একটু পরিহাস করবার লোভ সামলাতে পারলেন না। বাতাস গোড়া থেকেই প্রতিকূল ছিল। অনেক চেষ্টা ক'রেও ইঞ্জিন আর চালানো গেল না—

প্লেনও উড়ল না। অধিকাংশ রিপোর্টারই ফিরে গেলেন। যাঁরা যান নি তাঁরা আবার পরের দিন এলেন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য—সেদিনও ইঞ্জিন চালানো গেল না! রিপোর্টাররা বিদ্রূপ করতে করতে ফিরে গেলেন।

১৯০৪ সালে উইলবার লণ্ডনে তাঁর এক বন্ধু প্যাট্রিক আলেকজাণ্ডারের কাছে এরোপ্লেনে ক'রে আকাশে ওড়া নিয়ে একখানা চিঠি লেখেন। প্যাট্রিক আবার সেই চিঠিখানা লণ্ডন এরোনটিক্যাল সোসাইটির সভায় পাঠ করেন। ফলে সমস্ত লণ্ডন সহরে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়; কিন্তু তবু যেন লোকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারে নি।

এদিকে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় নীরবে তাঁদের কাজ ক'রে যাচ্ছিলেন। ১৯০৫ সালের শেষভাগে তাঁরা একটানা সাড়ে চব্বিশ মাইল পর্য্যন্ত উড়তে সক্ষম হলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিস্তর লোক জানাজানি হয়ে গেল। তাঁরা তাঁদের সমস্ত সময় এবং অর্থ এই কাজে নিয়োজিত করেছিলেন। এমন কি তাঁদের এক স্কুল মিস্ট্রেস্ বোনের কাছ থেকে টাকা ধার পর্য্যন্ত করতে হয়েছিল। তাঁদের শেষ আশা ছিল এরোপ্লেনেব পেটেণ্ট বিক্রী ক'রে আবার সামলে নেবেন। পাছে দুষ্ট লোক এসে তাঁদের যন্ত্রের কলকৌশল সব দেখে নেয় এইজন্য বাধ্য হয়েই তাঁদের যন্ত্রপাতি সব খুলে ফেলতে হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে পেটেণ্ট বিক্রয় নিয়ে কথাবার্ত্তা চালাতে লাগলেন।

তিন বছর পরে, ১৯০৫ সালে তাঁরা আবার জগতের সামনে

আত্মপ্রকাশ করলেন। অরভিল থেকে গেলেন আমেরিকাতেই এবং উইলবার তাঁর এরোপ্লেন হোয়াইট ফ্লাইয়ার নিয়ে চ'লে এলেন ফ্রান্সে। সেখানে তিনি একদিন একটানা সাড়ে সাতাত্তর মাইল পথ অতিক্রম ক'রে সবাইকে বিস্মিত ক'রে দেন। তাঁর যন্ত্রের উৎকর্ষ দেখে এক ফরাসী কোম্পানী তাঁর পেটেন্ট কিনে নিলেন।

এদিকে অরভিল আমেরিকায় ব'সে নানা রকম এরোপ্লেনের কসরৎ দেখাতে লাগলেন। একদিন সেল্‌ফরিজ নামে একজন সামরিক কর্ম্মচারীকে নিয়ে উড়তে গিয়ে প্রোপেলারের চেইন কেটে যায়। এরোপ্লেন সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। অরভিল দারুণ আঘাত পেয়েও বেঁচে গেলেন, কিন্তু সেলফরিজ তখন তখনই মারা যান।

এরপর থেকেই তাঁদের উপর সম্মান, অর্থ, প্রতিপত্তি অজস্র বর্ষিত হতে লাগল। ১৯১২ সালে উইলবার মারা যান। অরভিল এখনও বেঁচে আছেন।

উইলবার ইউরোপে যাবার কিছুদিন আগেই কিন্তু সেখানে এরোপ্লেনের আবিষ্কার হয়েছিল। সাঁতো-ডুমোঁ, ফারম্যান, ব্লীরিও, ভোয়াসা এঁরাই ছিলেন এবিষয়ে প্রধান উদ্যোগী। ইউরোপে প্রথম এরোপ্লেন তৈরী করেন সাঁতো-ডুমোঁ—এক ব্রেজিলবাসী ধনীর সন্তান। ডুমোঁ উনিশ শতকের শেষভাগে আকাশ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পড়াশুনা করবার জন্য প্যারিসে যান। প্রথমে তিনি কিছুদিন বেলুন নিয়ে গবেষণা করেন এবং রাইটদের আবিষ্কারের কিছুকাল পর থেকেই বাতাসের চেয়ে ভারী

আকাশযান তৈরীর দিকে তাঁর মন যায়। ১৯০৫ সালে তিনি প্রথম প্লেন তৈরী করেন, কিন্তু তা' দিয়ে আকাশে ওড়া সম্ভব হয়নি। তাঁর দ্বিতীয় প্লেনখানি আকাশে উড়েছিল। প্লেনখানাব নাম দেওয়া হয়েছিল 'দেমোয়াসেল'। প্লেনখানা দেখতে হয়েছিল অত্যন্ত নড়বড়ে এবং ওজনে অত্যন্ত হাল্‌কা—কোন ভাবী লোক উঠলে হয়ত ভেঙ্গেই যেত। প্লেনখানার ওজন ছিল মাত্র সওয়া তিন মণ। এর একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, মাত্র পঁয়ষট্টি ফুট দৌড়েই প্লেনটি উপরে উঠতে পাবত আর চলতে পারত ষাট মাইল বেগে।

লর্ড নর্থক্লিফের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, আকাশে ওড়ার যেন যথেষ্ট প্রচলন হয়। সেই জন্যই তিনি ঘোষণা করলেন যে, যে প্রথম এরোপ্লেনে ক'রে ইংলিশ চ্যানেল পার হ'তে পারবে তাকে তিনি এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেবেন।

এই পুরস্কাব লাভের জন্য প্রথমে চেষ্টা করেন একজন ফরাসী যুবক হিউবার্ট লেথাম। তাঁর প্লেনখানির নাম ছিল এ্যান্‌টয়নেট, খুব লম্বা একখানা মনোপ্লেন।

১৯০৯ সাল। ১৯শে জুলাই। তখনও ভাল ক'রে ভোর হয়নি। ছ'টা বেজে বিশ মিনিটের সময় লেথাম ক্যালের কাছাকাছি স্যান্‌গেট্‌ থেকে রওনা হ'লেন। চমৎকার আবহাওয়া। একটু কুয়াসা নেই। ক্যালের আকাশে একটুকরা মেঘ পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ইঞ্জিনও বেশ ভালভাবেই কাজ দিচ্ছে। লেথামের নিজেরই বিশ্বাস হ'ল যে, তিনি অনায়াসেই চ্যানেল

পার হয়ে ডোভার বন্দরে গিয়ে পৌঁছুতে পারবেন। এরোপ্লেনের কোন বিপদ-আপদ হ'লে লেথাম যদি জলে প'ড়ে যান, তাই তাঁকে উদ্ধার করবার জন্য হারপুন নামে একখানা ফরাসী টরপেডো বোট নিযুক্ত করা হ'ল। হারপুন চলেছে জলের উপর দিয়ে দুলতে দুলতে, লেথাম চলেছেন আকাশপথে অসীম নীলের রাজ্য পার হয়ে।

ক্যালে থেকে কয়েক মাইল অগ্রসর হ'লে লেথামের প্লেন মেঘের ভিতরে মিলিয়ে যায়; কিছুক্ষণ পরে আবার মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। অল্পক্ষণ পরে দ্বিতীয়বার সে মেঘের রাজ্যে প্রবেশ করল, কিন্তু এবার আর তাকে বেরুতে দেখা গেল না। সবাই অধিক আগ্রহে পল গুণতে লাগলেন। হারপুন চারদিকে খোঁজ আরম্ভ ক'রে দিল। লেথামের প্লেন ভেঙ্গে সমুদ্রে প'ড়ে গেছে! এই আকস্মিক বিপদে লেথাম বিশেষ কিছু যে বিচলিত হয়েছিলেন এমন মনে হয় না। আগাগোড়া ব্যাপারটাই যেন একটা মস্তবড় তামাসা এমন ভাবেই তিনি সমস্ত অবস্থাটাকে গ্রহণ করেছিলেন। জলের উপর প'ড়ে তাঁর প্লেনের কাঠামোটি ভাসছিল। তিনি তার উপরে কায়দামত ব'সে নিশ্চিন্তমনে একটি সিগারেট ধরালেন। হারপুন যখন তাঁকে উদ্ধার করতে এল তখনও তিনি সিগারেট খাচ্ছেন!

লেথাম চ্যানেল পার হ'তে পারেনি বটে, কিন্তু জলের উপর নেমেছেন তিনিই প্রথম। খুব দক্ষতার সঙ্গে না নামতে

পারলে তাঁর যে সলিল-সমাধি ঘটত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই বিপদে তিনি কিন্তু ঘাবড়ালেন না। ক্যালেতে নেমেই তিনি প্যারিসে ছুটলেন আর একখানা এরোপ্লেন যোগাড় ক'রে আর একবার চেষ্টা করবেন ব'লে। এদিকে আর একজন ফরাসী বৈমানিক লুই ব্লেরিও-ও ইংলিশ চ্যানেল পার হবার জন্য আয়োজন করেছিলেন। ব্লেরিও তাঁর এরোপ্লেনে ক'রে বহুবার ডাঙার উপর দিয়ে একটানা কুড়ি-পঁচিশ মাইল উড়েছেন। তাই তিনি যে ইংলিশ চ্যানেল পার হ'তে পারবেন সে বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্তই ছিলেন। তবু যাত্রার আগে ভাল ক'রে একবার ইঞ্জিন পরীক্ষা ক'রে নিলেন।

লেথাম চ্যানেল পার হবার চেষ্টা করেছিলেন ১৯শে জুলাই। ব্লেরিও রওনা হ'লেন ২৫শে। প্লেন ঠিকমত চলবে কিনা দেখবার জন্য ভোর সাড়ে তিনটার সময় ক্যালের কাছাকাছি ব্যারাক্‌স্ থেকে তিনি আকাশে উঠলেন। কিছুক্ষণ পরেই রওনা হ'লেন ডোভার অভিমুখে। সঙ্গে সঙ্গে জলের উপর দিয়ে চলল একটানা ভেস্‌ট্রিয়ার এস্‌কোপেট্।

ব্লেরিওর কাছে দিক নির্ণয় করবার কোন যন্ত্র ছিল না। তাই তিনি যে দিকে এস্‌কোপেট্ চলছিল সেই দিক লক্ষ্য ক'রে ছুট দিলেন। উপরে অসীম আকাশ, নীচে নীল জল থই-থই করছে। চারদিকে কোথাও গাছপালার সামান্য চিহ্ন পর্য্যন্তও নেই। কিন্তু ব্লেরিও থামলেন না। তিনি ক্রমাগত এগুতে লাগলেন। অবশেষে ইংলণ্ডের ডীল-অঞ্চলের তীরভূমি দেখা

গেল। ব্লেরিও ভোর পাঁচটা বারো মিনিটের সময়ে ডোভারের পিছনে নর্থফল-প্রান্তরে এসে অবতরণ করলেন।

ব্লেরিও ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে বাজি জিতেছেন, দেখতে দেখতে এই খবর ছড়িয়ে গেল। চারদিক থেকে সম্বর্দ্ধনা আসতে লাগল প্রচুর। কাগজে কাগজে ছবি ছাপা হ'ল—প্রবন্ধ লেখা হ'ল। এই সম্বর্দ্ধনায় লেথামও যোগ দিলেন। যদিও পুরস্কারের আর আশা ছিল না, তাহলেও লেথাম দু'দিন পরে আর একবার চ্যানেল পার হবার চেষ্টা করলেন। প্রায় পারও হয়েছিলেন, কিন্তু ডোভাব পৌঁছুবার মাইল দুই বাকী থাকতে তাঁর ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যায় এবং তিনি নেমে পড়তে বাধ্য হ'ন।

ইংলিশ চ্যানেল পার হবার পর থেকেই আকাশ-বিহারের পাল্লা একটু একটু ক'রে বাড়তে থাকে। পরের বছরই এক খবরের কাগজের পক্ষ থেকে নূতন একটি পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। যিনি সর্ব্বপ্রথমে চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে লণ্ডন থেকে ম্যানচেষ্টার পর্য্যন্ত উড়ে যেতে পারবেন তাঁকেই দশ হাজার পাউণ্ড মূল্যের এই পুরস্কার দেওয়া হবে। লণ্ডন থেকে ম্যাঞ্চেষ্টারের দূরত্ব প্রায় ১৮০ মাইল। এরোপ্লেনে ক'রে যে এতটা দূর যাওয়া যেতে পারে সে-কথা তখন কেউ বিশ্বাসই করেনি। সবাই মনে করেছিল, এ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে শুধু তামাসা করবার জন্য। ইংলিশ চ্যানেল, কুড়ি-পঁচিশ মাইলের ব্যাপার। আর এখানে ১৮০ মাইলের উপর পথ! এ পার হওয়া অসম্ভব!

কিন্তু সবাই অসম্ভব মনে করলেও, সেই অসম্ভবও সম্ভব হয়েছিল। প্রতিযোগী ছিলেন দু'জন—একজন ইংরাজ বৈমানিক গ্রেহাম হোয়াইট, আর একজন ফরাসী বৈমানিক লুই পলহাঁ। কিন্তু দু'জনে একসঙ্গে যাত্রা করেননি। ২৩শে এপ্রিল গ্রেহাম হোয়াইট লণ্ডনের উইলস্‌ডেন অঞ্চল থেকে যাত্রা করেন। ভোর পাঁচটার সময় রওনা হয়ে দু'ঘণ্টার মধ্যেই তিনি রাগবিতে পৌঁছে গেলেন। সেখানে ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম ক'রে তিনি ফের গন্তব্য স্থানের দিকে রওনা হ'লেন। কিন্তু এবারে যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকূল বাতাস বইতে স্থরু করল। তা সত্ত্বেও তিনি বাতাসের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। কিন্তু বিপদের উপর বিপদ। একটু পরেই ইঞ্জিনের গোলমাল আরম্ভ হ'ল। তখন বাধ্য হয়েই তাঁকে লণ্ডন থেকে ১১৭ মাইল দূরে লীচ্‌ ফিল্ড সহরে নামতে হ'ল। বাতাসের বেগ একটু একটু ক'রে বাড়তে লাগল। সমস্ত রাত ধ'রে আকাশে গুরু গর্জ্জন চলতে লাগল। ভোরের দিকে আবহাওয়ার অবস্থা ভাল হওয়া দূরে থাক আরও খারাপ হয়ে গেল। এর ভিতরে আর এরোপ্লেন চালান যায় না। কিন্তু বিপদ এইখানেই শেষ হয়নি। তিনি প্লেনের কাছে এসে দেখলেন ঝড়ের তাণ্ডবে প্লেনখানি গুরুতর রকমের জখম হয়েছে। একে আবহাওয়া একেবারে বিরূপ তায় ভাঙ্গা এরোপ্লেন। এ যাত্রা বাজির আশা ছেড়ে দিয়ে হোয়াইট তাঁর জখমী প্লেনখানি নিয়ে লণ্ডনে ফিরে এলেন।

এদিকে পলহাঁর এরোপ্লেন যোগাড় করতেই ২৭ তারিখ

এসে গেল। সারাদিন খেটে তিনি যাত্রার আয়োজন সারা করলেন। যোগাড়-যন্ত্র সম্পূর্ণ ক'রে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় তিনি রওনা হ'লেন। ঠিক করলেন একটানা লীচ্ফীল্ড পর্য্যন্ত উড়ে যাবেন। এদিকে পলহাঁ রওনা হয়েছেন শুনে হোয়াইটও তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার সময় যাত্রা করলেন। এই যুগান্তকারী প্রতিযোগিতার কথা যখন চার-দিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন তাঁদের নির্দ্দিষ্ট পথের দু'ধারে সারি দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে গেল—কেউ বা মজা দেখবার জন্য, কেউ বা উৎসাহ দেবার জন্য।

পলহাঁ বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। মত্ত বাতাস দাপাদাপি স্থুরু ক'রে দিল। তারই ভিতর দিয়ে পলহাঁ চলেছেন। প্লেন কখনও উপরে উঠে যাচ্ছে কখনও বা ছিটকে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। সেই ঝড়ো হাওয়া যেমন অশান্ত তেমনি কনকনে ঠাণ্ডা। পলহাঁর সমস্ত দেহ যেন শীতে অবশ হয়ে আসতে লাগল। নীচে পথ-প্রদর্শকের মত একখানা স্পেশ্যাল ট্রেন যাচ্ছিল। পলহাঁ তাই দেখে কোনমতে গতিপথ ঠিক রাখলেন। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে জোরে চেপে এল প্রবল বৃষ্টি। ঝড় তো রয়েছেই। কঠিন মৃত্যু যেন চারদিক থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে আরম্ভ করেছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আলোর শেষ রশ্মিটুকুও যেন পৃথিবীর বুক থেকে নিঃশেষে মুছে গিয়েছে।

এমন সময় দূরে লীচ্ফিল্ডের আলোকমালা দেখা গেল।

পলহাঁ ঠিক করলেন কোনও একটা মাঠ দেখে নেমে পড়বেন। ভাল ক'রে দেখবার জন্য প্লেন অনেকটা নামিয়ে নিয়ে এলেন। নীচেই একটা ফ্যাক্টরী ব'লে মনে হ'ল। তার পিছনে মাঠ। তাড়াতাড়ি ইঞ্জিন ঘুরিয়ে মাঠের দিকে রওনা হ'লেন।

ঘষ্‌ষ্‌ষ্‌—ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। পলহাঁ তেলের মিটারের দিকে তাকালেন। শূন্য ট্যাঙ্ক, এক ফোঁটা তেল নেই! এবার সুনিশ্চিত মৃত্যু। নীচে একটা ভাঁটিখানা গোছের কারখানা, পিছনে একফালি খোলা জমি। সেখানে আবার জালের মত টেলিগ্রামের তার বসানো। ভাববার আর সময় নেই। সাঁ-সাঁ ক'রে প্লেনখানি নীচে প'ড়ে যাচ্ছে। পলহাঁ নিষ্ঠুর মৃত্যুর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু তাঁর একটি স্নায়ু শিথিল হ'ল না, একটি পেশী কুঞ্চিত হ'ল না। সাঁ ক'রে স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিলেন, যদি টেলিগ্রাফের তারের দিকে পড়া যায় তবেই রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

রক্ষা তিনি পেলেন।

এদিকে পলহাঁ লীচ্‌ফিল্ডে অবতরণ করার প্রায় মিনিট পনেরো আগে গ্রেহাম হোয়াইট মাইল ষাটেক পিছনে এক জায়গায় অবতরণ করেন।

পাছে পলহাঁই আগে গিয়ে ম্যাঞ্চেষ্টার পৌঁছান এই ভয়ে গ্রেহামের ভাল ক'রে ঘুম হ'ল না। তন্দ্রা এবং জাগরণের ভিতর দিয়ে রাত বেড়ে চলল। অবশেষে রাত আড়াইটার সময়ে তিনি উঠে পড়লেন এবং রাত্রি শেষ না হতেই তাড়াতাড়ি রওনা

হ'লেন। কোথাও একটুক্‌রা আলো নেই। নিকষ কালো অন্ধকার যেন হাঁ ক'রে আছে। গ্রেহাম অগ্রসর হ'তে লাগলেন। যেমন ক'রেই হোক পলহাঁর আগে তাঁকে পৌঁছতেই হবে। নীচে দিয়ে সর্পিত গতিতে রেল লাইন চলেছে। মাঝে মাঝে দু'একটা সিগন্যালের বাতি অন্ধকারের মধ্যে মিট-মিট ক'রে জ্বলছে। গ্রেহাম তাই দেখেই এগুতে লাগলেন। খানিকদূর গিয়ে একটা মালগাড়ীর দেখা মিলিল। তাইতেই গ্রেহামের অনেকখানি সুবিধা হয়ে গেল।

ক্রমে একটু একটু ক'রে দিনের আলো ফুটে উঠল পূব আকাশের বুকে। কিন্তু বিপদ তাতে এক তিলও কমল না, বরং প্রভাত হবার সাথে সাথেই তাঁর বিপদ যেন শতগুণে বেড়ে গেল। ঝড়ো হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। প্রতিমুহূর্ত্তে আশঙ্কা হ'তে লাগল কখন প্লেনখানি ভেঙ্গে পড়ে। গ্রেহাম তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন প্লেনখানাকে ঠিক রাখতে; কিন্তু উন্মত্ত বাতাসের মুখে কোন কৌশলই খাটল না। শেষটায় ভোর চারটে চৌদ্দ মিনিটের সময় তাঁকে নেমে পড়তে হ'ল। কিন্তু তিনি জানতেন না যে মাত্র পাঁচ মিনিট আগে পলহাঁ তাঁর এরোপ্লেনে করে ম্যাঞ্চেষ্টার অভিমুখে রওনা হয়ে গেছেন।

গ্রেহাম আর ম্যাঞ্চেষ্টার পৌঁছুতে পারলেন না। পলহাঁ ভোর পাঁচটা বত্রিশ মিনিটের সময়ে ম্যাঞ্চেষ্টারে পোঁছুলেন। ২৭ তারিখ বিকাল সাড়ে পাঁচটায় রওনা হয়ে পরদিন ভোর পাঁচটা

বত্রিশ মিনিটের সময় তিনি গন্তব্য স্থানে পৌঁছে প্রতিযোগিতায় জয়ী হলেন।

পলহাঁর জয়ের খবর যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল তখন সবাই তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। ইংরাজেরাও এই অভিনন্দনে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু প্রসন্ন মনে নয়। কারণ গ্রেহাম হোয়াইট জিততে পারেননি কি না। গ্রেহামের মনে কিন্তু উদারতার অভাব ছিল না। তিনি যখন খবর পেলেন যে, তিনি হেরে গেছেন এবং পলহাঁই বাজি জিতেছেন, তখন তিনি সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বোধন ক'রে বলেছিলেন—"পলহাঁ দশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পেয়েছেন। এ ঠিকই হয়েছে। সমস্ত পৃথিবী খুঁজলেও তাঁর চাইতে ভাল বৈমানিক আর একটিও পাওয়া যাবে না। বিমান চালনায় আমি তাঁর কাছে শিশু।"

—৫—

"——দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে, রাত্রি নিশীথ, যাত্রীরা হুসিয়ার!"

এই প্রতিযোগিতায় একটা বড় উপকার হ'ল।

আগে যেমন লোক খুব দূরের পথ এরোপ্লেনে ক'রে যাওয়া যেতে পারে সেকথা মোটেই বিশ্বাস করত না, এখন সেই ধারণা ভেঙ্গে গেল। আগে যে-সব জায়গায় এরোপ্লেনে ক'রে যাওয়ার কথা কেউ ভাবতেও পারে নি, অনেকেই এখন সেই সব জায়গায় যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে সুরু করলেন। শুধু স্বপ্ন নয়, কেউ কেউ বেশ উৎসাহের সঙ্গে আয়োজন আরম্ভ করলেন। মাস ছয়েকের

মধ্যেই একজন ধনী আমেরিকান ঠিক করলেন তিনি আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেবেন। দূরপাল্লার পথ এরোপ্লেনে ক'রে উড়ে যাওয়া যেতে পারে, এ বিশ্বাস লোকের মনে এসেছে বটে; কিন্তু তাই ব'লে আটলান্টিক পার হওয়া—ছ' হাজার মাইলের উপর পথ সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে আসা— সে কখনই সম্ভব হ'তে পারে না। অনেকেই আমেরিকান বৈমানিক ওয়েল-ম্যানকে প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করলেন। এ যে একেবারে আত্মহত্যার সামিল। একশ'-আশি মাইল পথ যেতেই কত বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। তাও সেখানে ওড়া হয়েছিল ডাঙ্গার উপর দিয়ে। এখানে কত অজানা বিপদ লুকিয়ে আছে কে জানে? কিন্তু ওয়েল-ম্যান কোন কথায় কান দিলেন না। ঠিক করলেন এরোপ্লেনের বদলে এয়ার-সিপে ক'রে আটলান্টিক পার হবেন।

চুরুটের মত লম্বাটে ধরণের মস্ত বড় এক এয়ার-সিপ তৈরী হ'ল। একশ'-ষাট মণেরও বেশী মাল বইবার ক্ষমতা ছিল তার এবং উড়তে পারত ঘণ্টায় প্রায় বিশ মাইল বেগে। যত রকম সাবধানতা অবলম্বন করা যেতে পারে তার কিছুই বাদ দেওয়া হ'ল না। এয়ার-সিপের বেলুন যাতে খুব উপরে উঠতে না পারে অথবা খুব নীচেও হঠাৎ না নামতে পারে তার জন্য নতুন ধরণের একটা যন্ত্র লাগান হ'ল। একশ' গজ লম্বা একটা তারের একদিকে বাঁধা হ'ল এয়ার-সিপের সাথে আর অপর প্রান্ত থাকবে জলের উপরে। তারটাকে রাখা হ'ল গোল-গোল কাঠের চোঙের

ভিতরে। এই কৌশলটির নাম দেওয়া হ'ল ইকুইলিব্রেটর। হাওয়া জাহাজ উপরে উঠতে চাইলে ইকুইলিব্রেটরের ভারে সে নেমে আসবে। আবাব যদি নামবার লক্ষণ দেখা যায় তাহ'লে ইকুইালব্রেটবই ভাসিয়ে বাখবে। কারণ সে নিজেই জলে ভাসে। এত সব সত্ত্বেও পাছে কোন বিপদ ঘটে, তাই এয়ার-সিপের ভিতবে একখানা ছোট লাইফ-বোটও নেওয়া হ'ল। জাহাজের মধ্যে বেতারযন্ত্রও বসান হ'ল। ওয়েল-ম্যানের কিন্তু নিশ্চিন্ত বিশ্বাস ছিল যে, ইকুইলিব্রেটব যখন বয়েছে তখন আব ভয় কি ?

১৫ই অক্টোবর, ১৯১০ সাল।

যথাসময়ে ওয়েল-ম্যান সদলবলে এসে এয়ার-সিপে উঠলেন। তাঁর দলে ছিলেন সবশুদ্ধ ছ'জন লোক—ওয়েল-ম্যান নিজে, একজন অভিজ্ঞ চালক ক্যাপটেন সাইমন, একজন বেতার চালক, একজন ইঞ্জিনিয়াব এবং ত্ব'জন মিস্ত্রী। তা'ছাড়া তাঁরা একজন যাত্রী সঙ্গে নিলেন। যাত্রীটি হ'ল একটি কালো বিড়াল!

যাহোক্‌, হাওয়া জাহাজ তো ছাড়া হ'ল আটলান্টিক-সিটি থেকে। একটু একটু ক'রে ভূমিরেখা দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তারপর থেকেই আরম্ভ হ'ল গোলমাল। হঠাৎ দেখা গেল একটা ইঞ্জিন ভীষণ গরম হয়ে যাচ্ছে। ছুটো ইঞ্জিন বসানো হয়েছিল তাই রক্ষা। ইঞ্জিনিয়ার এসে পরীক্ষা করে দেখলেন ইঞ্জিনের ভিতরে বালি ঢুকে গেছে। তখন এই ইঞ্জিনটিকে বন্ধ ক'রে দিয়ে পরিষ্কার করবার ব্যবস্থা করতে হ'ল। তখন

একটি মাত্র ইঞ্জিন চলেছে, তাই জাহাজখানি অনেকটা বিপথে গিয়ে পড়ল। কিন্তু উপায় কি?

ক্রমে বেলা দুপুরের দিকে গড়িয়ে চলল। সূর্য্যের তেজ ক্রমেই বাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে এয়ার-সিপের ভিতরকার গ্যাস গরমে ফুলে উঠতে লাগল। এয়ার-সিপও অনেকটা উপরে উঠে গেল। এদিকে যে ইকুইলিব্রেটরের উপর ওয়েল-ম্যানের এতখানি ভরসা ছিল সেই তাকে সব চাইতে বিপদে ফেলল। ঢেউ-এর আঘাতে ইকুইলিব্রেটর পাগলের মত দাপাদাপি সুরু করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে এয়ার-সিপের উপরেও অনবরত হ্যাঁচকা টান পড়তে লাগল। শেষকালে অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল যে, আরোহীদের আর স্থির হয়ে বসবার যো রইল না। অবিরাম ঝাঁকাঝাঁকিতে গা-হাত-পায়ে ব্যথা ধ'রে গেল।

দিন কোন মতে কাটল। ওয়েল-ম্যান আশা করেছিলেন রাত্রির দিকে অবস্থার হয়ত উন্নতি হবে। কোথায় উন্নতি? অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। সূর্য্য ম্লানমুখে সাগরের বুকে মুখ লুকালেন। চারিদিক ঠাণ্ডা হয়ে এল। গ্যাস ঠাণ্ডা হয়ে যেতে হাওয়া জাহাজ অনেকখানি নীচে নেমে এল। এবারেও ইকুইলিব্রেটর সাহায্য করতে পারল না—জাহাজ ক্রমে নীচে নেমে আসছে—আর রক্ষা নেই। এবার সবশুদ্ধই জলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। এয়ার-সিপকে হাল্কা ক'রে দেবার জন্য ওয়েল-ম্যান তাড়াতাড়ি ইঞ্জিনের তেল অনেকটা জলে ফেলে দিলেন। জাহাজও লাফ দিয়ে উপরে উঠল।

সব রকম লক্ষণ দেখে ওয়েল-ম্যান বুঝতে পারলেন যে, আটলান্টিক পার হওয়ার আশা খুবই কম, নেই বললেই চলে। এতক্ষণে তাঁরা দু'শ মাইল পথও অতিক্রম করতে পারেন নি। তখন চিন্তা হ'ল—উদ্ধার পাওয়া যায় কি ক'রে? চারদিক অন্ধকারে ঢাকা। তাঁরা অধীর আগ্রহে চারদিকে তাকাতে লাগলেন, কোন জাহাজ দেখা যায় কিনা। পল গুণে গুণে প্রহর যায়। জাহাজের আর দেখা মেলে না। অবশেষে দূরে একখানা জাহাজ দেখা গেল। তাঁরা বেতারবার্ত্তা পাঠালেন। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, জাহাজে কোনও বেতার যন্ত্র ছিল না। তার পর আলোর সাহায্যে নানা রকম সঙ্কেত করা হ'তে লাগল। কিন্তু সব বৃথা! জাহাজের নজরে তা পড়ল না। জাহাজখানা তাঁদের ইকুইলিব্রেটরের পাশ ঘেষে বেরিয়ে গেল, কিন্তু মাথার উপরে যে কয়েকটি আর্ত্ত প্রাণীর মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আশ্রয় ভিক্ষা করছে, সে খবর অজানাই রয়ে গেল!

যাত্রার দ্বিতীয় দিন ভোরবেলা থেকেই ঝড়ের লক্ষণ প্রকাশ পেল। দেখা গেল এতক্ষণে তাঁরা মাত্র আড়াইশ' মাইল এগিয়েছেন। নীচে উন্মত্ত সাগর তুমুল তাণ্ডবে মেতেছে। বড় বড় ঢেউগুলো একটার পর একটা হুঙ্কার দিয়ে ভেঙ্গে শতধা হয়ে যাচ্ছে। মুহূর্ত্তের জন্য নীল জলের উপর কে যেন ফেনার আস্তরণ বিছিয়ে দিল। কিন্তু এসব দেখে মুগ্ধ হবার মত অবস্থা তখন কারুরই নয়। বিড়াল যাত্রীটি তীক্ষ্ণকণ্ঠে তার মর্ম্মান্তিক অভিযোগ জানতে লাগল। ঝড়ের টানা-হ্যাঁচড়ায় আরোহিগণ

অবসন্ন। কিন্তু চুপ ক'রে ব'সে থাকলে তো চলবে না। শেষ-কালে বাধ্য হয়ে একটা ইঞ্জিন জলে ফেলে দিতে হ'ল। এতে ভার খানিকটা কমল বটে, কিন্তু শুধুমাত্র বাকী ইঞ্জিনটির জোরে এয়ার্-সিপকে আর আয়ত্তের মধ্যে রাখা গেল না। সারারাত ধ'রে বাতাস তাকে নিয়ে যেমন খুসি লোফালুফি খেলতে লাগল।

সেই কাল রাত্রিও এক সময়ে প্রভাত হ'ল। নতুন প্রভাত তাদেব জন্য নতুন আশাব বাণী বহন করে নিয়ে এল। একটু পরেই দূবে ট্রেণ্ট-নামে একখানা জাহাজ দেখা গেল। আশার এই ক্ষীণ রশ্মি দেখেই মরণোন্মুখ আরোহিগণ আবার যেন মন্ত্র-বলে সঞ্জীবিত হয়ে উঠলেন। জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য নানা রকম সঙ্কেত করা হতে লাগল। ওয়েল-ম্যান রুদ্ধ-শ্বাসে পল গুণতে লাগলেন।

যাক্ বাঁচা গেল! জাহাজের লোক সঙ্কেত দেখতে পেয়েছে। জাহাজখানা পূরোদমে এয়ার-সিপের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। এদিকে বিমানচারীরাও বহু কষ্টে লাইফ-বোটখানি নামালেন। তারপর সবাই উঠে এলেন জাহাজে, মায় বিড়ালটি পর্য্যন্ত! আর সেই এয়াব-সিপখানা? ওজন কমে যাওয়ায় সে হঠাৎ একলাফে অনেকখানি উপরে উঠে গেল—তারপর ঝড়ো হাওয়ায় মিলিয়ে গেল অসীম আকাশে।

সবাই ফিরে এলেন দেশে। যে ইঞ্জিনিয়ার এয়ার-সিপখানা তৈরী করেছিলেন তিনি আবার নতুন ক'রে আর একখানি

এয়ার-সিপ বানানোর কাজে হাত দিলেন। কিন্তু তাতে বোধ হয় বিধাতার সম্মতি ছিল না। একদিন পরীক্ষা করতে গিয়ে এয়ার সিপখানিতে আগুন ধ'রে যায়। ইঞ্জিনিয়ার এবং তাঁর চারজন সহকর্ম্মীও অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান।

মানুষ আকাশপথে আটলান্টিক পার হতে চেয়েছিল। প্রকৃতি যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করেছেন, মানুষ চেয়েছিল সেই বাধা অতিক্রম করতে। প্রকৃতি ঝড়-ঝঞ্ঝা, মেঘ-বৃষ্টি এই সব অনুচর নিয়ে তাকে বাধা দিয়েছেন। প্রকৃতির প্রতিশোধের আগুনে কত লোক আত্মাহুতি দিয়েছে! কিন্তু তার সেদিনকার পরাজয়কেই মানুষ চরম ব'লে মেনে নেয় নি। সর্ব্বস্ব পণ, সে প্রকৃতিকে পরাভূত করবেই। দিন যাবে, মাস যাবে, বছরও চ'লে যাবে! এই দুঃসাহসিক যুদ্ধে প্রাণ দিয়ে তাকে জয়ের পথ প্রস্তুত করতে হবে।

ওয়েল-ম্যানের এই দুর্ঘটনায় অনেকের ধারণা হ'ল যে, আটলান্টিক পার হতে অনেক—অনেক দিন বাকী। দুই-এক বছরে কিছুই হবে না।

তারপরে এল প্রথম মহাযুদ্ধ। যুদ্ধ আরম্ভের কিছুদিনের মধ্যেই সব দেশই বুঝতে পারল যে, মারণাস্ত্রের মধ্যে এরোপ্লেনের মত মারাত্মক আর কিছুই নেই। এরোপ্লেন-যুদ্ধে জার্ম্মানীর তখন অসীম প্রতাপ এবং ইংলণ্ডের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। যুদ্ধের গোড়ার দিকে জার্ম্মানীর ছিল এক হাজারের উপর সরকারী বিমান। বেসরকারী বিমানও একেবারে কম ছিল না,

প্রায় চারশ'র কাছাকাছি। এই খানেই শেষ নয়। তার এয়ার-সিপ এবং জেপলিন মিলিয়ে ছিল চল্লিশখানা, তার ভিতরে চৌদ্দখানাই ছিল জেপলিন। তখন ইংরাজের বিমান ছিল বড় জোর একশ'খানা! কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইংরাজেরা সামলে নিল। যুদ্ধের সময়ে একটানা আকাশে ওড়া অথবা দীর্ঘপথ অতিক্রম করা, এই দুয়েতেই জার্ম্মানী ছিল সবার সেরা।

যুদ্ধের চার বছরের ভিতরে এরোপ্লেনের যত দ্রুত উন্নতি হয়েছে এত আর কখনও হয় নি। এই সময় থেকেই জল-বিমানের খুব প্রচলন হয়। নৌযুদ্ধে জল-বিমানের সুবিধা হ'ল এই যে, সে আকাশেও যেমন উড়তে পারে, নামতেও পারে তেমনি জলের উপরে। সাগরের বুকে সাবমেরিন খুঁজে বার করতে নৌ-বিমানের জুড়ি ছিল না। এ বিষয়ে ইংরাজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ইংরাজের নৌ-বিমানের সার্ভিস্ সমস্ত জগৎ জোড়া। যুদ্ধের সময় একটা নতুন ধরণের নৌ-বিমান আবিষ্কারের চেষ্টা চলেছিল এবং এতদিনে তা' সফল হয়েছে। দেখা গেছে যতটা মাল বোঝাই করলে এরোপ্লেন আকাশে উঠতে পারে, তার চাইতে ঢের বেশী মাল সে বহন করতে পারে যদি তাকে একবার আকাশে তুলে দেওয়া হয়। তাই মালবাহী প্লেনগুলোকে আর একটা বিমানের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়। নীচের বিমানখানা উপরের বিমানখানাকে কাঁধে ক'রে উপরে উঠে পড়ে। পরিমাণমত উপরে ওঠা হ'লে উপর ও নীচের দুই প্লেনেরই চালক যন্ত্রের সাহায্যে বুঝতে পারে যে, এবার

ছাড়াছাড়ি হবার পালা এসেছে। তখন উপরের বিমানখানাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধের সময় এই ধরণের বিমানের সবে গোড়াপত্তন করা হয়েছিল, এতদিনে এর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

—৬—

"চলিয়াছি কাহার উদ্দেশে,
দিক হ'তে দিগন্তরে, দেশ হ'তে দেশে!"

মহাযুদ্ধের পর রণক্লান্ত পৃথিবী কিছুদিন বিশ্রাম করল। দুর্দ্দিনের অবসাদে কর্ম্মচাঞ্চল্য যেন ঈষৎ স্তিমিত হয়ে এল। অল্প কয়েক বছর। তারপরেই আরম্ভ হ'ল নতুন ক'রে অভিযান—দিকে দিকে, আটলান্টিকে, প্রশান্ত মহাসাগরে, উত্তর মেরুতে, দক্ষিণ মেরুতে! আফ্রিকার নীল বনশ্রেণীর উপর দিয়ে, প্রশান্ত মহাসাগরের ক্ষুব্ধ জলরাশি পার হয়ে এরোপ্লেনের বিজয় অভিযান চলেছে। শুধু যে লোক-দেখানো এবং খ্যাতি অর্জ্জন করবার জন্যই এই সব দূর পাল্লার বিমান চালনা হয়েছে তা' নয়। প্রথম প্রথম গৌরব অর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষাই ছিল প্রধান এবং প্রবল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন দেখা গেল হাজার হাজার মাইল সমুদ্র পার হওয়া খুবই সম্ভব তখন খেয়াল হ'ল কি ক'রে আকাশপথে জরীপের কাজে অসংখ্য লোক দুর্গমপথে পাড়ি দিয়েছেন, অজস্র অর্থব্যয় হয়েছে।

আকাশজয়ের ইতিহাসকে মোটামুটি পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় আটলান্টিক এবং প্রশান্ত মহাসাগর অভিযান। তৃতীয় এবং চতুর্থ হ'ল উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর রহস্য ভেদ। সর্ব্বশেষ অধ্যায়টি হ'ল উর্দ্ধ-আকাশে ওড়া।

আটলাণ্টিক অভিযান

এর মধ্যে আটলান্টিক অতিক্রমের চেষ্টাই প্রথমে হয়েছে এবং এই চিরচঞ্চল সমুদ্রটি জয়ের কাহিনীই অদ্ভুত রকমে রোমাঞ্চকর।

আমেরিকাই প্রথমে এরোপ্লেন আবিষ্কার করে। তাই তার বরাবরই ইচ্ছা ছিল আটলান্টিক অতিক্রম করবে সেই প্রথম। এই দুঃসাহসিক কাজের ভার নিলেন আমেরিকার নৌ-বিভাগ। ঠিক হ'ল নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে লিসবন পর্য্যন্ত উড়ে যাওয়া হবে। মাঝখানে বিশ্রাম করা যাবে এজোর্সএ।

এইজন্য তিনখানা সামরিক নৌ-বিমান বেছে নেওয়া হ'ল—তাদের নাম হ'ল NC 1, NC 3, NC 4। প্রত্যেকখানিই অত্যন্ত বিরাট—এক একটিতে তেল নেওয়া যায় আঠারোশ' গ্যালন। বিমানগুলো তৈরী হয়েছিল বম্বার হিসাবে ব্যবহার করবার জন্য, তবে যাত্রীও বহন করত! এদের ভিতরে NC 1 বিমানখানা একষট্টীজন লোক নিয়ে উড়তে পারত।

যতরকমের সাবধানতা অবলম্বন করা যেতে পারে তা' সবই করা হ'ল দু' হাজার মাইলের উপর পথ। সমস্ত পথে ব্রিটিশ

এবং আমেরিকার, নৌবহর টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল। নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে এজোর্স পর্য্যন্ত প্রায় চৌদ্দশ' মাইল পথ পাহারা দিতে লাগল আমেরিকার নৌবহর—প্রতি •ষাট মাইল অন্তর একখানা ক'রে আমেরিকান ডেষ্ট্রয়ার ; বাকী পথের ভার বইল ব্রিটিশ বহরের উপর।

এদের ভিতরে NC 4 প্লেনখানাই মাত্র গন্তব্যস্থল পর্য্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল। NC 1 এবং NC 3 ত্বখানা বিমানই এজোর্সের কাছাকাছি. গিয়ে বেচাল হয়ে পড়ে। NC 1 তো এজোর্সের শ'ত্বই মাইল আগেই জলে প'ড়ে যায়। আরোহীদের অবশ্য উদ্ধার করা হয়েছিল, কিন্তু প্লেনখানা এমনভাবে জখম হয়ে যায় যে, তাকে ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর ছিল না। NC 3 ও এজোর্সের কাছে এসে পথ হারিয়ে ফেলে। তারপব সমুদ্রে নেমে কাছাকাছি একটা দ্বীপে চ'লে যায়।

১৯১৯ সালের ১৬ই মে। রাত্রির অন্ধকার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তারই ভিতর যাত্রা করলে NC 4।

পবিচালক ছিলেন লেফটেন্যাণ্ট কমাণ্ডার রীড, অত্যন্ত দক্ষ লোক। একটানা উড়ে সওয়া পনেরো ঘণ্টার মধ্যে NC 4 এসে গেল এজোর্স দ্বীপে। এখানে দশ দিন বিশ্রাম ক'রে তাঁরা যাত্রা করলেন লিসবনের দিকে এবং নির্বিঘ্নে লিসবনে এসে পৌঁছলেন।

গত মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার কিছুদিন আগে লণ্ডনের এক খবরের কাগজের পক্ষ থেকে এক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

যিনি প্রথম একটানা আটলান্টিক পার হয়ে আমেরিকা থেকে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে আসতে পারবেন তাঁকেই এই পুরস্কার দেওয়া হবে। দশ হাজার পাউণ্ডের পুরস্কার। অনেকেই উৎসাহে মেতে উঠলেন। কিন্তু এর মধ্যেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল, তাই তখন আর কিছুই সম্ভব হ'ল না। যুদ্ধ থেমে যাবার পরেই আবার চেষ্টা আরম্ভ হ'ল। আমেরিকান নৌ-বিমান NC 1, NC 3 এবং NC 4 নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে রওনা হবার দু'দিন পরেই দু'জন ইংরাজ বৈমানিক হ্যারি হকার এবং ম্যাকেঞ্জি গ্রীড্ আটলান্টিক পার হবার জন্য রওনা হলেন। তাঁরা যাত্রা করলেন নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের সেণ্টজন সহর থেকে। একদিন যায়, দু'দিন যায়, তাঁদের আর কোন সংবাদ আসে না। তারপর যখন আট দিনের ভিতরেও কোন খোঁজ পাওয়া গেল না তখন সবাই মনে করল যে তাঁরা আর নিশ্চয়ই বেঁচে নেই। কিন্তু বেঁচে তাঁরা ছিলেন। আটদিন পরে খবর পাওয়া গেল, নিউফাউল্যাণ্ড থেকে হাজার মাইল দূরে একখানা ডেনিশ জাহাজ তাঁদের সমুদ্রের উপর থেকে উদ্ধার করেছে।

তাঁরা বাজি জিততে পারেন নি বটে, কিন্তু এই দুর্গম পথে পাড়ি দিয়ে যে অসীম সাহস দেখিয়েছেন তারও মূল্য কম নয়। বীরত্ব এবং সাহসের পুরস্কার স্বরূপ সম্রাট্ তাঁদের রাজকীয় বিমানবাহিনীর ক্রস উপহার দিলেন এবং সংবাদপত্রের তরফ থেকে তাঁরা পাঁচ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পেলেন।

সেই বছরই জুনমাসে দু'জন ইংরাজ বৈমানিক ক্যাপটেন জন এ্যালকক্ এবং লেফটেন্যাণ্ট লুবটেন ব্রাউন নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে আয়ারল্যাণ্ড পর্য্যন্ত একটানা উড়ে গিয়ে এই পুরস্কার লাভ করেন।

যাত্রার প্রথম থেকেই ঘন কুয়াসা। উপরে-নীচে, সামনে-পিছনে কিছুই দেখা যায় না। প্রতি মুহূর্ত্তে আশঙ্কা হ'তে লাগল, এই বুঝি এরোপ্লেন সাগরের জলে পড়ল। একে ঘন কুয়াসা, তার উপর আবার মাঝে মাঝে বরফ পড়ছে। সমস্ত পথটা প্রায় আন্দাজের উপর নির্ভর ক'রে চালাতে হ'ল। অবশেষে দূরে তীরভূমি দেখা গেল। আয়ারল্যাণ্ডের উপকূলে প্লেন এসে গেছে। একটু পরে ক্লিফডেনের বেতার ঘাঁটির বড় বড় মাস্তুল নজরে পড়ল। এবারে নামতে হবে। এ্যালকক্ চক্রাকারে সহরের উপর ঘুরতে লাগলেন। কেহই তা লক্ষ্য করল না। তখন তাঁরা আলোক-পিস্তল ছুড়তে লাগলেন সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য। এই পিস্তল ছোড়া হ'লে আকাশে রঙ্-বেরঙের আলো দেখা যায়। কিন্তু এই আলোক-সঙ্কেত ব্যর্থ হ'ল, কারুর নজরেই পড়ল না। তখন নিজেদেরই কোন জায়গা খুঁজে নিয়ে নামবার ব্যবস্থা করতে হ'ল। কিছু দূরেই দেখা গেল একটা মাঠ। কিন্তু তাঁরা জানতেন না যে, ওটা আসলে মাঠ নয়, একটা জলাভূমি, উপর থেকে মাঠের মত দেখাচ্ছে। নামতে গিয়ে প্লেনের মাথা মাটির ভিতরে ব'সে গেল অনেকখানি। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আরোহীরা অক্ষতদেহে রক্ষা পেয়ে

গেলেন। এই দু'হাজার মাইল পথ যেতে তাঁদের পুরো ষোল ঘণ্টাও লাগে নি।

তাঁদের এই অসাধারণ সাফল্যে দেশ-বিদেশ থেকে অভিনন্দন আসতে লাগল। রাজা তাঁদের নাইট উপাধিতে ভূষিত করেন। আর সেই দশ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার তো তাঁরা পেলেনই। আটলান্টিক-বিজয়ের স্মারক হিসাবে তাঁদের ভাঙ্গা এরোপ্লেন-খানা কেনসিংটনের সায়ান্স মিউজিয়ামে রেখে দেওয়া হয়েছে।

এ্যালককের ভাগে কিন্তু এই রাজসম্মান বেশীদিন ভোগ করা হয়ে উঠল না। মাসছয়েক পরে প্যারিসে যাবার সময়ে এক বিমান-দুর্ঘটনায় তিনি সাংঘাতিক রকমে আহত হ'ন এবং সেই আঘাতেই তার মৃত্যু ঘটে।

আমেরিকান নৌবিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রথম নৌবিমানে ক'রে আটলান্টিক অতিক্রম করা হয়। তারপরে এ্যালকক্ এবং ব্রাউন এরোপ্লেনে ক'রে পাড়ি দিলেন। এয়ার-সিপই বা বাকী থাকে কেন? এ্যালককের সাগর পাড়ি দেবার এক মাসের মধ্যেই একখানা ব্রিটিশ এয়ার-সিপ R 34 আটলান্টিক পারাপার করে। R 34 হ'ল প্রায় সাড়ে ছ'শ ফুট লম্বা বিরাট এক এয়ার-সিপ, সঙ্গে সানবিম ইঞ্জিন লাগান। ইঞ্জিনের জন্য তেল নেওয়া যেত ছাপ্পান্ন হাজার গ্যালন এবং স্থির বাতাসে এয়ারসিপ-খানা ষাট মাইল বেগে পথ চলতে পারত।

আটলান্টিক পার হওয়া এর উদ্দেশ্য ছিল বটে, কিন্তু আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। বহুদিন থেকেই ইংরাজদের একটি ইচ্ছা

ছিল, তা'রা আটলান্টিক পারাপার করবার জন্য একটি এয়ার-সিপ সার্ভিস্ খুলবে। তাই সাগরের উপরের আবহাওয়ার অবস্থা কি রকম, এয়ার-সিপ চলাচলের পক্ষে অনুকূল কি প্রতিকূল তা জানা একান্ত প্রয়োজন। R 34এর আটলান্টিক যাত্রার এই ছিল আসল উদ্দেশ্য।

সতর্কতাসূচক সবরকম ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হ'ল। এমন কি দুখানা ক্রুজার টাইগার এবং রিনাউনকে মোতায়েন রাখা হ'ল মাঝসমুদ্রে। তা'রা এয়ার-সিপকে সামুদ্রিক আবহাওয়ার সংবাদ সরবরাহ করবে। যে মাসে এ্যালককেরা আটলান্টিক পার হয়েছিলেন তার পরের মাসেই অর্থাৎ জুলাই মাসে R 34এর যাত্রা করবার কথা। যাত্রার দিন ঠিক হ'ল ২রা জুলাই এবং কর্ত্তৃপক্ষ ঠিক করলেন আমেরিকা পৌঁছে নিউইয়র্ক সহরের উপর কয়েকবার প্রদক্ষিণ ক'রে তবে এয়ার-সিপখানা মাটিতে নামবে।

ভোর-ভোর থাকতেই R 34 ফার্থ অব ফোর্থ থেকে রওনা হ'ল। কিন্তু যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা ঘন কুয়াসার ভিতর পড়লেন। চারদিকে কিছুই দেখা যায় না। সব সময়েই ভয় রয়েছে কখন মাটিতে ঠোকা লাগে। অথচ খুব উপরেও উঠতে পাচ্ছেন না। কারণ এত বেশী পেট্রোল বোঝাই করা হয়েছে যে, তিন হাজার ফুটের বেশী এয়ার-সিপখানাকে তোলাই গেল না। তারপরে স্কট্‌ল্যাণ্ডের পর্ব্বতমালা পার হয়ে তবে তাঁরা কুয়াসার হাত থেকে নিস্তার পান। তিনদিন বেশ নিরা-

পদেই কাটল। চতুর্থ দিনে তাঁরা প্রবল ঝড়ের মুখে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে বজ্র এবং বিদ্যুৎ। বাতাসের ঝাপ্‌টায় এয়ার-সিপ মাতালের মত টলতে লাগল। একজন ইঞ্জিনিয়ার তো টাল খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলেন, অল্প একটুর জন্যে বেঁচে গেলেন। পঞ্চম দিনে-নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের উপকূল দেখা গেল। আরও একদিন গেল। দূরে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ নগরী দেখা যাচ্ছে। এখনও নিউ-ইয়র্ক অনেক দূরে। অথচ সঙ্গে আব বেশী তেলও নেই। তাই নিউইয়র্ক প্রদক্ষিণেব কল্পনা ছেড়েই দিতে হ'ল। এয়ার-সিপ এসে যখন লঙ্‌ দ্বীপে রুজভেল্ট-প্রান্তরে নামল তখন বেলা ন'টা বেজে বিশ মিনিট মাত্র হয়েছে। ২রা যাত্রা ক'রে তাঁরা ছ' তারিখে এসে গন্তব্যস্থলে পৌঁছুলেন। তাঁদের সবশুদ্ধ সময় লেগেছিল একশ' আধঘণ্টা বারো মিনিট এবং পথ অতিক্রম করেছিলেন প্রায় সওয়া তিন হাজার মাইল। কয়েকদিন বিশ্রাম ক'রে এয়ার-সিপখানা ১০ই জুলাই ঘরের পানে যাত্রা করল। এবারে হাওয়া ছিল অনুকূল, তাই সময় লাগল অনেক কম। পঁচাত্তর ঘণ্টার মধ্যে তাঁরা ফিরে এলেন স্বদেশে।

R 34এর শেষের ইতিহাস বড় করুণ। বছর দেড় পরে সে একবার নিজেব দেশের উপর দিয়েই যাত্রা করেছিল. কিন্তু ইয়র্ক-সায়ার পর্ব্বতে ধাক্কা খেয়ে গুরুতররূপে জখম হয়। চালক অতিকষ্টে তাকে হাউডেন এরোড্রাম পর্য্যন্ত নিয়ে এসেছিল। কিন্তু সেইখানে এসেই সে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়।
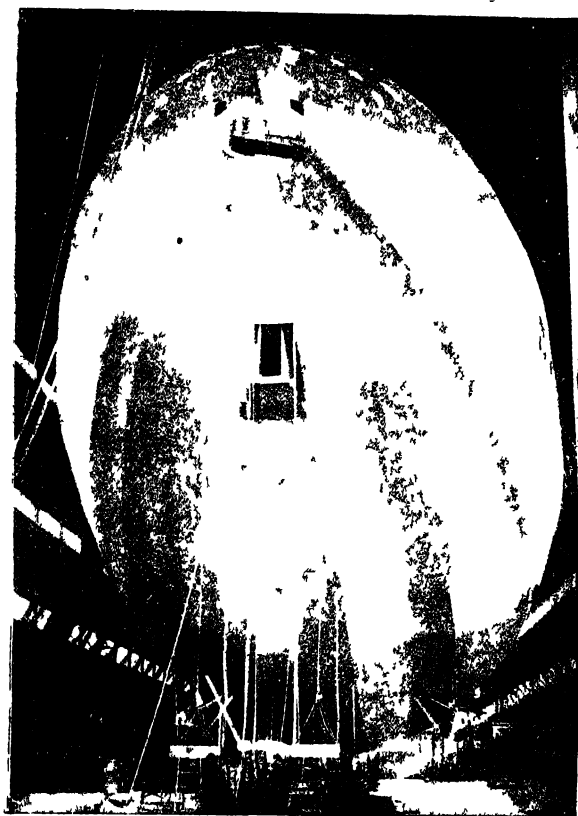
'R 101' নামক এয়ার-সিপ [পৃঃ ৫৭

[তৈরী হওয়ার সময়ের দৃশ্য]

এয়ার-সিপের ব্যাপারে ইংরাজ এবং আমেরিকা উভয়েরই বরাত অত্যন্ত মন্দ। ইংরাজ গৌরব ক'রে এক অতিবৃহৎ এয়ার-সিপ তৈরী করেছিল। তার নাম দেওয়া হয়েছিল R 101। সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হ'তে, ১৯৩০ সালে R 101 ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করে। সঙ্গে বিস্তর যাত্রী। কয়েকজন সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীও ছিলেন। রাত্রিবেলা ফ্রান্সের বুভেতে এক পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা লেগে এয়ার-সিপ একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। আটচল্লিশজন আরোহী, একজনও বাঁচতে পারেন নি। ১৯১৯ সালে ইংরাজের একখানা এয়ার-সিপ NS 11 উত্তর সাগরে মারা পড়ে। তাতে সাতজনের প্রাণহানি হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই R 38 নামে আর একখানি বিরাট এয়ার-সিপ ধ্বংস হয়। লোক মারা যায় চুয়াল্লিশ জন।

এদিকে এ বিষয়ে আমেরিকার ভাগ্যও ভাল নয়। ১৯২৫ সালে তার সিনানড়োয়া নামে একখানা এয়ার-সিপ নষ্ট হয়। ১৯৩৩ সালে নষ্ট হয় আর একখানা। পঁইত্রিশ সালে আমেরিকার সমর-বিভাগ থেকে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম এয়ার-সিপ মেকন নির্ম্মাণ করা হয়। ফেব্রুয়ারী মাসেই সেখানা ক্যালিফোর্ণিয়ার উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরের জলে প'ড়ে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

এয়ার-সিপ এবং জেপ্‌লিনের জগতে জার্ম্মানী ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এয়ার-সিপ এবং জেপ্‌লিন মিলিয়ে সবশুদ্ধ সে

একশ' উনত্রিশখানা তৈরী করেছিল। তার মধ্যে মাত্র দু'খানা এখনও আছে। একখানা তার নিজের কাছে আছে, এবং আর একখানা দিতে হয়েছে আমেরিকাকে। এইখানার নাম ছিল **R 3,** যুদ্ধের কিছু আগে তৈরী। তারপর একদিন যুদ্ধ থেমে গেল এবং ১৯২৪ সালে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে জার্ম্মানী তার **R 3**-কে আমেরিকার হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়। আমেরিকা তার নাম পাল্‌টে রাখল লস্‌ এ্যাঞ্জেল্‌স্‌। গতযুদ্ধে জার্ম্মানীর জেপ্‌লিনের ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর। ৪৬ খানা যুদ্ধের সময়েই নষ্ট হয়, ২৫ খানা ধ্বংস হয়ে যায়, পাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় এই ভয়ে। সাতখানাকে এমনি নষ্ট ক'রে ফেলা হয়। আর ১১ খানা মিলিত জাতির কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং ২১ খানাকে কুলে ফেলতে হয়। ছ'খানার কোন পাত্তাই পাওয়া যায় নি এবং দশখানার প্ল্যান করা হয়েছিল, কিন্তু হাতে কলমে তৈরী করা পর্য্যন্ত আর হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু এদের ভিতরে নাম করা হ'ল দুখানা—গ্রাফ জেপ্‌লিন এবং হিণ্ডেন্‌বুর্গ। গ্রাফ জেপ্‌লিন লম্বায় ছিল সাতশ' ছিয়াত্তর ফুট এবং প্রস্থে আটানব্বই ফুট। যেমন মজবুত তেমনই বেগবান্‌। ঘণ্টায় ৮০ মাইল বেগেও চলতে পারত। এয়ার-সিপের পক্ষে এই গতি কম কথা নয়। এই জেপ্‌লিন-খানা ছিল জার্ম্মান জনসাধারণের সম্পত্তি। চাঁদা তুলে এর খরচ যোগান হয়েছিল। আর সে খরচও অল্প-স্বল্প নয়, আড়াই লক্ষ পাউণ্ড। গ্রাফ জেপ্‌লিনকে আকাশে ভাসান হয় ১৯২৮

সালের সেপ্টেম্বর, মাসে। পরীক্ষামূলকভাবে তাকে পাঠান হ'ল নিউইয়র্কের নিকটবর্ত্তী লেকহার্ষ্টে। এই যাত্রার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ডাক্তার এক্‌নার। জেপ্‌লিন চালনায় তাঁর দক্ষতা বহুদিনের। R 3 নামে যে জেপ্‌লিনখানা যুদ্ধের পরে আমেরিকাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল যুদ্ধের আগে এই ডাক্তার এক্‌নারই তাকে জার্ম্মানী থেকে এজোর্স দ্বীপ হয়ে আমেরিকায় নিয়ে যান।

এক্‌নারের কর্ত্তৃত্বাধীনে গ্রাফ্ জেপ্‌লিন আমেরিকা থেকে নির্ব্বিঘ্নে দেশে ফিরে এল। কিন্তু এসেই এক্‌নার মত দিলেন যে গ্রাফ্ অত্যন্ত পুরাণো ধরণের জেপ্‌লিন, একে দিয়ে আটলান্টিক পারাপার করার চেষ্টা করাই উচিত নয়। কিন্তু এক্‌নারের কথা ফলে নি। তারপরেও ন'বছর ধ'রে গ্রাফ্ যাত্রী নিয়ে রীতিমত যাতায়াত করেছে। যেবার সে প্রথম আমেরিকা থেকে এল তার পরের বছরই সে একুশ দিন সাড়ে সাত ঘণ্টায় সমস্ত পৃথিবী ঘুরে এসেছে। তার আগে এত অল্প সময়ের মধ্যে কেউ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারে নি।

১৯৩২ সালে গ্রাফ্ রীতিমত যাত্রী এবং মাল নিয়ে আটলান্টিক পারাপার করতে লাগল এবং ছ'বছরের ভিতরই সে অন্ততঃ চারশ' বার যাওয়া-আসা করেছে। তারপর ১৯৩৭ সালে হঠাৎ একদিন তাকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। তাকে নাকি আর আকাশে উড়তে হবে না। এর কারণ হ'ল হিণ্ডেনবুর্গ জেপ্‌লিনের অপঘাত মৃত্যু।

হিণ্ডেনবুর্গ জার্ম্মানীর সর্ব্ববৃহৎ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জেপ্‌লিন। ৮০৩ ফুট লম্বা, হিণ্ডেনবুর্গ চল্লিশজন যাত্রী নিয়ে পঁয়ষট্টি ঘণ্টায় ইয়োরোপ থেকে আমেরিকায় যেতে পারত এবং ফিরে আসতে পারত আরও কম সময়ে—মাত্র পঞ্চাশ ঘণ্টায়। ছত্রিশ সালে তৈরী হবার পর থেকেই সে নিয়মিত ফ্রাঙ্কফোর্ট-অন-মেইন এবং লেকহার্ষ্টের ভিতর যাতায়াত করত। সাঁইত্রিশ সালেও প্রথম পাড়ি সে দিয়েছিল। কিন্তু নামতে গিয়েই হঠাৎ কেমন ক'রে আগুন লেগে যায় এবং মাত্র বত্রিশ সেকেণ্ডের ভিতরে অতবড় জেপ্‌লিনখানা একেবারে ভস্মসাৎ হয়ে গেল। ঊনচল্লিশজন যাত্রীর মধ্যে এগারজন এবং সত্তরজন মাল্লার মধ্যে একুশজন সঙ্গে সঙ্গেই সেই অগুনে পুড়ে মারা যায়। যাঁরা সাংঘাতিক রকমে জখম হয়েছিলেন, কয়েকদিনের মধ্যে, তাঁদেরও অনেকে মারা যান। মাঠের চারদিকে অগণিত লোক। তাদের বিস্মিত চোখের সামনে এত বড় ধ্বংসলীলা সংঘটিত হ'ল, কিন্তু বিস্ময়ের প্রথম ঘোর কাটবার আগেই শুধু এক বিরাট ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই বাকী রইল না!

এই মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে দেখা গেল, জেপ্‌লিনকে আকাশে ভাসিয়ে রাখবার জন্য যেসব হাইড্রোজেন গ্যাসভর্ত্তি ব্যাগ রাখা হয়েছিল তাতে আগুন লেগেই এই বিপদ ঘটেছে। হাইড্রোজেন বাতাসের চাইতে অনেক হাল্‌কা, কিন্তু অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে ভর্ত্তি করলে আগুনের ভয় থাকে না। কিন্তু জার্ম্মানীর

হিলিয়াম পাবার উপায় নেই। হিলিয়ামের ব্যবসা একমাত্র আমেরিকার হাতে এবং সে এই গ্যাস কাউকেই বিক্রী করে না। তার আশঙ্কা হ'ল পাছে তার গ্যাস দিয়ে জেপ্‌লিন তৈরী ক'রে তারই বিরুদ্ধে লাগান হয়।

কিন্তু সে যাক্। গ্রাফ্ জেপ্‌লিনও হাইড্রোজেন গ্যাসে ভর্ত্তি। তাই লিণ্ডেনবুর্গ ধ্বংসের পরেই তাকেও খারিজ ক'রে দেওয়া হয়।

জার্ম্মানী কিন্তু এত বিপদেও হাল ছাড়ে নি। তার বিশ্বাস আবার একদিন সে জেপ্‌লিনকে কাজে লাগাতে পারবে।

আটলান্টিক বিজয়ে সব চাইতে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন আমেরিকান বৈমানিক কর্ণেল লিণ্ডবার্গ।

বিগত মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরের বছরেই একটানা নিউইয়র্ক থেকে প্যারিস পর্য্যন্ত উড়ে আসবার জন্য অরটিগ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। পুরস্কারের মূল্য ছিল পাঁচ হাজার পাউণ্ড। পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল ১৯১৯ সালে এবং লিণ্ডবার্গ সেই পুরস্কার দাবী করলেন পূরো আট বছর পরে, ১৯২৭ সালে। এতেই বোঝা যায় কাজটি কতখানি দুরূহ ছিল। সাড়ে তিন হাজার মাইলের উপর পথ সোজা কথা নয়।

এই পুরস্কার লাভের প্রথম চেষ্টা করেন বৈমানিক রেনি ফন্‌ক্ ১৯২৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ফনক্‌এর প্লেন প্রথমে তো উপরে উঠতেই চায় না। তারপর যদি বা উঠল, অল্প কিছুদূর গিয়েই মাটিতে প'ড়ে যায়। দেখতে দেখতে সমস্ত

প্লেনখানিতে আগুন ধ'রে গেল। আরোহী ছিলেন তিনজন, তার মধ্যে তু'জনই এই আগুনে পুড়ে তখন তখনই মারা যান।

মাস সাতেক পরের কথা। এপ্রিল মাসের শেষাশেষি তু'জন ফরাসী বৈমানিক এই পুরস্কার লাভের জন্য চেষ্টা করেন। তাঁদের নাম ছিল চার্লস্ নান্‌গেসার এবং ফ্রান্সিস্ কেলি। যাত্রা করার কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁরা কুয়াসার আড়ালে অন্তর্হিত হয়ে যান। সেই যে তাঁরা মিলিয়ে গেলেন, আর তাঁদের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।

এর পরেই এলেন লিণ্ডবার্গ। পঁচিশ বছরের যুবক, অতিশয় সুশ্রী। একটু পাগলাটে ধরণের, তাই যেন সবার কাছে আরও বেশী ভালবাসার পাত্র। আন্তর্মহাদেশীয় বিমান চালনায় রেকর্ড ক'রে তিনি সবে নিউইয়র্কে এসে পোঁছেছেন। ইচ্ছা যে পারিস পর্য্যন্ত উড়ে গিয়ে অরটিগ পুরস্কার লাভ করবেন। এর আগে অবশ্য এ্যালকক্ আটলান্টিক পার হয়েছেন। কিন্তু সে ছিল তু'হাজার মাইলের পথ। আর এখানে নিউইয়র্ক থেকে প্যারিস সাড়ে তিন হাজার মাইলেরও বেশী। লিণ্ডবার্গ একটু ক্ষ্যাপাটে ধরণের, একটু গোঁয়ারগোবিন্দ কিন্তু এ যে জীবন নিয়ে খেলা! তার উপর আবার তাঁর প্লেনখানি অত্যন্ত ছোট, চালক ছাড়া আর একজনেরও বসবার জায়গা নেই। শুধু কি তাই? প্লেনের ইঞ্জিন মাত্র একটি। সেটি বিকল হয়ে গেলে সুনিশ্চিত মৃত্যু। তাঁর ইঞ্জিনের একটি মাত্র গুণ ছিল যে, তাকে জলের বদলে হাওয়া দিয়ে ঠাণ্ডা রাখা

হ'ত। তাই ইঞ্জিনের ওজন ছিল কম। বন্ধুবান্ধবেরা তাঁকে অনেক নিষেধ করলেন ; কিন্তু লিণ্ডবার্গ অটল।

লিণ্ডবার্গের প্লেনের নাম ছিল 'স্পিরিট অব্ সেণ্ট লুই'। এই সঙ্গে আরও দু'খানা প্লেন প্রতিযোগিতায় যোগ দিল। একখানা 'কোলাম্বিয়া' অপরখানি 'আমেরিকা'। শেষের খানির চালক হলেন আমেরিকার নৌ-বিভাগের কমাণ্ডার বার্ড। বার্ড আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বৈমানিক এবং আবিষ্কারক। তিনি পরে উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু অভিযান ক'রে অনেক নতুন দেশ এবং অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন।

১৯২৭ সালের ২০এ মে। তখন সবে ভোর হয়েছে।

রুজভেল্ট ফিল্ড থেকে যাত্রা সুরু হবে। তিনজন প্রতি-যোগী। সহরের লোক ভেঙ্গে পড়ল মাঠের উপর। ক্রমে যাত্রার সময় হয়ে এল। ভোরের আলো একটু একটু ক'রে ফুটে উঠছে। ক্রমে সাতটা বেজে বাহান্ন মিনিট হ'ল। ঘর্‌র্‌র্‌র্‌—স্পিরিট অব্ সেণ্ট লুই আকাশে উঠছে। বন্ধুবান্ধবের অনেকেরই মনে হ'ল এই যেন তা'রা শেষ বারের মত লিণ্ড-বার্গকে দেখছেন। কেউ কেউ রুমাল উড়িয়ে অভিনন্দন জানালেন। নিভৃতে দু'একজনের চোখের জলও পড়ল।

শোঁ-শোঁ ক'রে স্পিরিট অব্ সেণ্ট লুই উড়ে চলেছে। কোথাও ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী হয়ে কুয়াসা উড়ে বেড়াচ্ছে। কখনও বা হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। কখনও আবার মেঘ-শিশুরা নীচে দুরন্ত ছেলের মত ছুটে বেড়াচ্ছে। ছবির মত

মাঠ-ঘাট-প্রান্তর পিছনে ফেলে 'সেণ্ট লুই' এগিয়ে চলেছে। কোথাও শ্যামল অরণ্য, কোথাও নীল জল থৈ-থৈ করছে। তারপর দূরে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড দেখা গেল। লিণ্ডবার্গ স্বচ্ছন্দে উড়ে চলেছেন। ক্রমে দুস্তর আটলাণ্টিক এসে গেল। নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ডের অস্পষ্ট ভূমিরেখা অস্পষ্টতর হয়ে দিগন্তে মিলিয়ে গেল। এবার শুধু জল আর জল—সূর্য্যকিরণে ঝিক্‌মিক্ করছে। লিণ্ডবার্গ তন্ময় হয়ে এরোপ্লেন চালাচ্ছেন। হঠাৎ তিনি চকিত হয়ে উঠলেন। সামনে কুয়াসার অরণ্য; ডাইনে-বাঁয়ে, উপরে-নীচে, সামনে-পিছনে- সর্ব্বত্র। সঙ্গে দিক-নির্দ্দেশক ভাল যন্ত্র নেই। বেতার যন্ত্র পর্য্যন্ত নেই প্লেনের ভিতরে। লিণ্ডবার্গ ঠিক করলেন কুয়াসার উপরে উঠে যাবেন।

দু'হাজার ফুট, তিন হাজার ফুট, চার হাজার ফুট—উপরে, আরো উপরে—সাত হাজার,—সাড়ে সাত হাজার—আট হাজার। বরফের মত ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে চোখে লাগছে। হাত-পা অবশ হয়ে আসছে।

সর্ব্বনাশ! প্লেনের ডানার উপর বরফ জমতে আরম্ভ করেছে। আবার নেমে আসতে হ'ল নীচে। দশ ঘণ্টা এই রকম কঠিন যুদ্ধ ক'রে লিণ্ডবার্গ কুয়াসার হাত থেকে রেহাই পেলেন। তখন হাজার মাইলের উপর পথ অতিক্রান্ত হয়েছে। তখনও আড়াই হাজার মাইল বাকী।

নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে পাঁচশ' মাইল অগ্রসর হবার পরেই একখানা যাত্রী জাহাজ লিণ্ডবার্গের প্লেনখানি দেখতে পায়।

সঙ্গে সঙ্গে সে দিকে দিকে এই খবর বেতারযোগে পাঠিয়ে দেয়। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় তাকে আয়ারল্যাণ্ডের উপকূলে দেখা গিয়েছিল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘিরে আসতে লাগল। লিণ্ডবার্গ তখন ইংলণ্ডের উপকূল ছাড়িয়ে ফ্রান্সের উপর দিয়ে চলেছেন। এদিকে এই সংবাদ পেয়ে লিণ্ডবার্গকে অভ্যর্থনা করবার জন্য ফরাসী জনতা লে-বুর্গে সমবেত হতে লাগল—শতে শতে, হাজারে হাজারে। তবু লোক সমাগমের বিরাম নেই। সত্যই কি লিণ্ডবার্গ তা'হলে আসছেন? না অন্য কোন পথভ্রষ্ট এরোপ্লেন? যদি বা তিনি লিণ্ডবার্গই হ'ন, শেষ পর্য্যন্ত কি তিনি নিরাপদে এসে পৌঁছুতে পারবেন? হয়ত শেষ মুহূর্ত্তের অসতর্কতায় কোন দারুণ দুর্ঘটনা ঘটবে।

তখন রাত প্রায় দশটা বাজে। এরোড্রোমের কর্ত্তৃপক্ষ আকাশে সার্চ লাইট ফেলে ফেলে দেখতে লাগলেন। লিণ্ডবার্গের যাতে এরোড্রোমে চিনে নিতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য আলোক-বাজি ছোড়া হ'তে লাগল। চঞ্চল জনতা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। চঞ্চল দৃষ্টিপাতে তা'রা আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তন্ন-তন্ন ক'রে দেখছে, কোথায় সেই 'স্পিরিট অব সেণ্ট লুই'। জনতা নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য পাঁচশ' পুলিশ-সৈন্য মোতায়েন রাখতে হয়েছে।

হিস্-স্-স্—ঐ ঐ দেখা যাচ্ছে 'স্পিরিট অব্ সেণ্ট লুই'! জনতা এবার উৎসাহে বাঁধভাঙ্গা বন্যার জলের মত অবাধ্য হয়ে উঠল। কর্ত্তৃপক্ষের শত অনুরোধ-উপরোধেও কিছুই ফল হ'ল

না। শেষে বন্দুকধারী পুলিশের শরণাপন্ন হ'তে হ'ল। তা'রা বন্দুকের বাট দিয়ে যথেচ্ছ আঘাত করতে লাগল সেই বিক্ষুব্ধ জনতার উপর। কোন মতে সামান্য একটা জায়গা ক'রে দিতেই লিণ্ডবার্গ অপূর্ব্ব দক্ষতার সঙ্গে নেমে পড়লেন। আর যাবে কোথায়! প্লেনখানি মাটি স্পর্শ করবার সঙ্গে সঙ্গেই জনতা উন্মত্তের মত লিণ্ডবার্গকে ছোঁ মেরে নিল। অভ্যর্থনার অত্যাচারে তাঁর জামা-কাপড় ছিন্ন-ভিন্ন। কিন্তু কে সেদিকে খেয়াল করে? তারপর সুরু হ'ল উচ্ছ্বাস এবং অভ্যর্থনার পালা। তাঁকে নিয়ে যেন লোফালুফি চলতে লাগল। সাড়ে তিন হাজার মাইল একটানা উড়ে এসে রাত সাড়ে দশটায় তিনি এরোড্রোমে পৌছান। তারপরে পূরো সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধ'রে তাঁর উপর জনতার অভ্যর্থনার অত্যাচার চলল। ভোর চারটার সময় যখন তিনি নিষ্কৃতি পেলেন তখন তাঁর দেহ থেকে শেষ শক্তিবিন্দুটিও নিঃশেষে নিংড়ে নেওয়া হয়েছে। মানুষের অন্তরের পূজা যে তাঁর পক্ষে এমন মর্ম্মান্তিক হবে একথা কে জানত?

এই বাজি জিতে তিনি অরটিগ পুরস্কার এবং পাঁচ হাজার পাউণ্ড মূল্যের উড্র-উইলসন শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। দেশ-বিদেশ থেকে বৃষ্টির ধারার মত অজস্র সম্মান তাঁর উপর বর্ষিত হ'তে লাগল। তাঁকে আন্তর্জ্জাতিক ট্রান্স-ওসেনিক পাইলট্‌স্ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট করা হ'ল। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট তাঁকে সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার কংগ্রেসনাল মেডাল উপহার দিলেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের কাছ থেকে তিনি পেলেন রাজকীয় বিমান-

বাহিনীর ক্রশ। ফরাসী প্রেসিডেণ্ট তাঁকে দিলেন 'লিজিয়ন অব্ অনার' উপাধি। বেলজিয়ামের রাজা তাঁকে 'অর্ডার অব্ সেণ্ট লিওপোল্ড'-এর ক্রশ উপহার দিয়ে সম্মানিত করলেন। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিমান চালক ব'লে দিকে দিকে তাঁর খ্যাতি রটে গেল।

এদিকে ইংলণ্ডে যাবার জন্য কেবল নিমন্ত্রণ আসতে লাগল। ইংরাজেরা জাতি হিসাবেই একটু বেশী গম্ভীর। কোন কিছুতেই সহজে বিচলিত হয় না এবং উচ্ছ্বাসও প্রকাশ করে না। কিন্তু লিণ্ডবার্গ যেদিন ক্রয়ডন এরোড্রোমে এসে নামলেন সেদিন তাদের সেই চিরাচরিত সংযম ভেসে গেল কোথায়! ইংরাজেরা সেদিন যে পরিমাণ উচ্ছ্বাস দেখিয়েছে তাতে বলতে হয় যে, ফরাসীরা সে তুলনায় কিছুই করে নি। লিণ্ডবার্গ যাতে স্বচ্ছন্দে নামতে পারে তার জন্য খানিকটা জায়গা বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল। অধীর জনতা তার বাইরে অপেক্ষা করছে, কখন লিণ্ডবার্গ আসেন, এই ভরসায়। প্রথম দিকে জনতা শান্তই ছিল। কিন্তু যখন আকাশের বুকে ছোট একটি বিন্দুর মত প্লেনখানিকে দেখা গেল তখন আর জনতাকে আয়ত্তে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। সেই বেড়া ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সমস্ত মাঠ লোকে ভর্ত্তি—তিল ধারণের ঠাঁই নেই! প্লেন নামবে কোথায়? স্পিরিট অব্ সেণ্ট লুই চক্রাকারে মাথার উপর ঘুরতে লাগল। তখন এরোড্রোমের কর্ত্তৃপক্ষ অনেক ক'রে খানিকটা জায়গা ক'রে দিলেন। লিণ্ডবার্গও টুপ ক'রে নেমে পড়লেন সেইখানে। কিন্তু

তাঁর প্লেনেব চাকা মাটিতে ছোঁবার সঙ্গে সঙ্গেই জনতা উন্মত্তের মত ছুটে এল। এখুনি বুঝি লোক চাপা পড়ে। কেউ কেউ চীৎকার ক'রে উঠল। লিণ্ডবার্গ দেখলেন, বিপদ সামনে। এখনই হয়ত কয়েকজন মাবা পড়বে। তখন তিনি তাঁর বিমান চালনার কৌশল দেখালেন। যাবা প্রায় এরোপ্লেনের গায়ের উপর এসে পড়েছিল, সেই ভয়ার্ত্ত লোকদের ঠিক মাথাব উপর দিয়ে লিণ্ডবার্গ ফের আকাশে উঠে গেলেন। এক চুলের জন্য মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পেল না। এব পরে তা'রা লিণ্ডবার্গকে নামবার পথ দেয়।

তারপর লিণ্ডবার্গ যখন দেশ-দেশান্তর থেকে জয়মাল্য নিয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন তখন আমেবিকাবাসীরা তাঁকে উৎসাহের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে চলল—দিনেব পর দিন, মাসের পর মাস! এর যেন আর বিরাম নেই। এই উপলক্ষে তিনি পঁয়ত্রিশ লক্ষের উপর চিঠি পেয়েছিলেন। তা ছাড়া কত যে উপহার, কত যে অভিনন্দন তার আর শেষ নেই। হাজার হাজার কুমারী তাঁকে বিবাহ করবার আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখেছেন। লিণ্ডবার্গ যেন সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রের বীরত্ব, তেজস্বিতা এবং যৌবনের প্রতিনিধি তাই তিনি যখন জগতের রঙ্গমঞ্চে নিজের জয়পতাকা তুলে ধরলেন, তখন সে গৌরব যেন প্রত্যেক আমেরিকাবাসীরই। তাই তিনি সবার এত প্রিয়, এত গৌরবের।

লিণ্ডবার্গের দেখাদেখি আটলান্টিক পার হবার ধূম প'ড়ে গেল। জুন মাসের গোড়ার দিকেই আর একজন বৈমানিক

চেম্বারলিন নিউইয়র্ক থেকে একটানা উড়ে গিয়ে বার্লিনের একশ' মাইলের ভিতর অবতরণ করেন। তিনি লিণ্ডবার্গের চাইতেও বেশী পথ অতিক্রম করেছিলেন—৩,৯০০ মাইল! সময় লেগেছিল প্রায় তেতাল্লিশ ঘণ্টা। ঐ মাসেরই একেবারে শেষের দিকে কমাণ্ডার বার্ড কয়েকজন যাত্রী নিয়ে প্যারিসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। শেষের দিকে আবহাওয়া ছিল খারাপ—শুধু খারাপ নয়, অত্যন্ত খারাপ। তাই বার্ড বাধ্য হয়ে ফ্রান্সের উপকূলে জলের মধ্যে নেমে পড়েন। প্লেনটি একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু আরোহীরা কোনমতে রক্ষা পান।

এর পর থেকেই কথা ওঠে যে, ইয়োরোপ এবং আমেরিকার ভিতর যাত্রীবাহী এরোপ্লেনের প্রবর্ত্তন করতে হবে। কিন্তু এতদিনকার অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেল যে, এ কাজ খুব সোজা হবে না। প্রথমতঃ খুব ভাল এবং শক্তিশালী ইঞ্জিন চাই। দ্বিতীয়তঃ আবহাওয়ার খবর ভাল ক'রে জানা দরকার। কিন্তু এই নিয়ে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও চলতে লাগল। কয়েক বছর পরে যখন আমেরিকার প্যান-আমেরিকান এয়ারওয়েজ আয়ারল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলে একটা নৌ-বিমানের ঘাঁটি করবার জন্য আইরিশ প্রেসিডেণ্ট ডি-ভ্যালেরার সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাচ্ছিলেন তখন লিণ্ডবার্গ একবার ডি-ভ্যালেরাকে নিয়ে আকাশে উঠেছিলেন।

এতদিন শুধু বৈমানিকেরা আমেরিকা থেকেই ইয়োরোপে উড়ে এসেছেন। ইয়োরোপ থেকে আমেরিকায় এরোপ্লেনে

ক'রে প্রথমে উড়ে যান তিনজন বৈমানিক—ক্যাপ্টেন কোয়েল, ফন্ হুয়েন ফিল্ড এবং জেম্‌স্ ফিট্‌মরিস্। প্রথম দুজন জার্ম্মান, শেষের জন আইরিশম্যান।

উড়বার ক্ষেত্রে মেয়েরাও পিছনে প'ড়ে নেই। বেলুন আবিষ্কারের কাল থেকেই মেয়েরা মাঝে মাঝে উড়বার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। স্ত্রীজাতির ভিতরে প্রথমে আকাশে ওঠেন ম্যাডাম থিবল্। তাঁর সঙ্গী ছিলেন ফ্লেরাঁ। ১৭৮৪ সালের ৪ঠা জুন। ফ্রান্সের লিওঁ নগরী। বিরাট প্রান্তরের মধ্যে অগণিত লোক সমবেত হয়েছে। এমন কি সুইডেনএর রাজা গুস্তভ্ পর্য্যন্ত এসেছেন। মুহুর্মুহু জয়ধ্বনির মধ্যে থিবল্ এবং ফ্লেরাঁর বেলুন আকাশে উঠল। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট তাঁরা আকাশে ছিলেন। তারপর দু'মাইল দূরে এক জায়গায় বেলুনটি নেমে আসে।

তারপর এল এরোপ্লেনের যুগ। সেক্ষেত্রেও মেয়েরা পিছনে প'ড়ে থাকতে চাইলেন না। অদম্য সাহসের সঙ্গে তাঁরা আকাশ-জয়ের সাধনায় আত্মনিয়োগ করলেন।

বিমান চালনায় মেয়েদের ভিতরে যাঁরা নাম করেছেন তাঁদের মধ্যে এ্যামেলিয়া ইয়ারহার্ট এবং এ্যামি জনসন-এর নামই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এ্যামেলিয়াই মেয়েদের মধ্যে প্রথম আটলান্টিক অতিক্রম করেন। ১৯২৮ সালে তিনি প্রথম আটলান্টিক পাড়ি দেন, বৈমানিক হিসাবে নয়, ফ্রেণ্ডসিপ নামে একখানা এরোপ্লেনের যাত্রী-হিসাবে। যদিও এ'যাত্রা যথেষ্ট

বিপদসঙ্কুল ছিল, কিন্তু তিনি সমস্ত পথটাই যেন উপভোগ করেছেন। পথের প্রায় আগাগোড়াই ছিল কুয়াসায় ঢাকা। প্লেন কখনও উপরে উঠছে, কখনও নামছে। একটা কথা কিন্তু তিনি বলেছেন যে, বিমান চালনায় আমাদের চোখ-কানের উপর বেশী বিশ্বাস না রেখে যন্ত্রেব দিকে নজর দেওয়া ভাল।

১৯৩২ সালের মে মাসে তিনি একাকী বিমান-যোগে আটলান্টিক পার হয়েছিলেন। ছোট একখানি প্লেন, বাহুল্য-বর্জ্জিত। যাত্রা করবার ঘণ্টা চারেক পরে তিনি একবার হঠাৎ পিছন ফিরে দেখেন—সর্ব্বনাশ! ইঞ্জিনের পাইপ থেকে আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে। কিছুক্ষণের চেষ্টায় আগুনকে যদি বা আয়ত্তের মধ্যে আনা গেল, তখন আবার পেট্রোল চুয়াতে আরম্ভ করেছে। অ্যামেলিয়ার আশঙ্কা হ'ল সমস্ত প্লেনে না আগুন ধ'রে যায়। কিন্তু ভগবানের কৃপায় আগুন আব ধরল না। এদিকে তার উচ্চতা মাপবার যন্ত্রটি পথের মধ্যে গেল বিকল হয়ে। সমুদ্রের জল থেকে কতটা উপরে আছেন কিছুই বুঝবার যো নেই। এমন কি আন্দাজ করবার উপায় পর্য্যন্ত নেই, চারদিকে এমন ঘন কুয়াসা। কখন প্লেন এত উপরে উঠে যাচ্ছে যে, ডানার উপর বরফ জমতে সুরু করে, কখনও বা এত নীচে নেমে আসে যে, কুয়াসার ভিতর দিয়ে বিক্ষুব্ধ ঢেউসব ঝাপসা দেখা যায়।

তিনি সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন মাত্র সওয়া তের ঘণ্টায়। এর আগে এত অল্প সময়ে কেউ এই পথ অতিক্রম করতে পারেন

নি। এ্যামেলিয়া আটলান্টিকের রেকর্ড করলেন। এই অসামান্য সাফল্যের পর থেকেই তাঁর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে তাঁর নামকরণ করলেন 'লেডী লিণ্ডবার্গ' অথবা সংক্ষেপে শুধু 'লেডী লিণ্ডি'। দেখতে তিনি সুন্দরী নন, কিন্তু মুখে সর্ব্বদাই একটি মিষ্টি হাসির আমেজ লেগে আছে। অত্যন্ত অমায়িক এবং সরল ব্যবহার— কে বলবে তাঁর এতবড় জগৎ-জোড়া নাম!

প্রশান্ত মহাসাগর অভিযান

"তুমি দুস্তর, তাই তুমি প্রশান্ত—"

দূরপাল্লার বিমান চালনার ইতিহাসে আটলান্টিক-বিজয়ের কাহিনীই সর্ব্বাপেক্ষা চমকপ্রদ। কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে মানুষ অসাধ্য সাধন করেছে। হাজার হাজার মাইল পথ। নীল জলরাশি থৈ-থৈ করছে। মাঝে মাঝে বিন্দুর মত দু' একটি দ্বীপ।

সানফ্রান্‌সিস্‌কো থেকে হাওয়াই দ্বীপের দূরত্ব ২১০০ মাইল। ১৯২৫ সালের ৩১শে আগষ্ট আমেরিকার নৌ-বিভাগ থেকে একখানা নৌ-বিমান হাওয়াই দ্বীপের দিকে পাঠানো হয়। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল প্রশান্ত মহাসাগর জয়ের গৌরব তাঁরাই প্রথমে অর্জ্জন করবেন। তাঁদের সঙ্গে ছিল কিছুদিনের মত রসদ, নানা রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, আর ছিল বেতারে খবর

পাঠাবার এবং শুনবার যন্ত্র। যাত্রার সুরু থেকেই বাতাস প্রতিকূল। প্রবল বাধার ভিতর দিয়ে বৈমানিকেরা অগ্রসর হলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা পৌছুতে পারেন নি; তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় জলের উপরে নেমে পড়লেন। এদিকে বেতারে খবর-পাঠাবার যন্ত্রটি খারাপ হয়ে গেছে, কোথাও যে সংবাদ পাঠাবেন তার উপায় নেই। অথচ তাঁদের শুনবার যন্ত্রটি চমৎকার কাজ দিচ্ছে। তাঁরা হারিয়ে যাওয়ার পর থেকেই তাঁদের জন্য খোঁজ আরম্ভ হ'ল। বেতাব প্রতিষ্ঠান থেকে অনুসন্ধানের সেই সব কথা বলা হ'ত আর সমুদ্রের বুকে ব'সে তাঁরা তাই শুনতেন। কখনও আশা হ'ত কখনও বা নিরুৎসাহ হয়ে পড়তেন। তারপর একদিন হঠাৎ শুনলেন বেতার প্রতিষ্ঠান থেকে বলছে—এত অনুসন্ধানেও যখন কোন ফল হ'ল না, তখন আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। এই খবর শুনে কি যে মনের অবস্থা হতে পারে তা' আমরা কল্পনাও করতে পারি না। আশার যে মৃদু বাতিটি এতক্ষণ তাঁরা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, এই ঝাপ্‌টায় সেটি নিঃশেষে নিভে গেল। চারদিকে অন্ধকার—গভীর হতাশার নিকষ কালো অন্ধকার। খাবার ফুরিয়ে গেছে। এক ফোঁটা পানীয় জল নেই। চারদিকে অফুরন্ত জল— অথচ একবিন্দু মুখে তুলবার উপায় নেই। ক্ষুধায় নাড়ী জ্বলে যাচ্ছে, তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আসছে। জল— শুধু এক ফোঁটা জল!

ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক'রে যখন তাঁরা মৃতপ্রায় তখন একখানা সাবমেরিন তাঁদের উদ্ধার করে।

এরই বছর দুই পরে সমর-পরিষদ থেকে একখানা এরোপ্লেন হাওয়াই অভিমুখে পাঠানো হয়। বৈমানিক ছিলেন লেফ্‌-টেনাণ্ট মেটল্যাণ্ড এবং লেফ্‌টেনাণ্ট হেগেনবার্গার! আগের বারের বিপদের কথা তাঁদের খুব ভাল ক'রেই মনে ছিল। তাই সতর্কতামূলক কোন কিছুই বাদ দেওয়া হ'ল না। কারণ একবার যদি কোনমতে গন্তব্যস্থল ছাড়িয়ে চ'লে যায় তা'হলে হাজার মাইলের মধ্যে আর কোন আশ্রয় পাবার সম্ভাবনা নেই।

তাঁদের চেষ্টা সফল হ'ল। মাত্র ছাব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ২৪০০ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে তাঁরা হাওয়াই দ্বীপের রাজধানী হনলুলুতে পৌছান। তাঁদের দেখাদেখি পনেরো দিনের মধ্যেই আবার দু'জন বৈমানিক হাওয়াই পর্য্যন্ত উড়ে যান। সমস্ত পথ তাঁদের কুয়াসার ভিতর দিয়ে পার হতে হয়েছে।

এর কিছুদিন পরেই হাওয়াই-নিবাসী এক কাষ্ঠব্যবসায়ী দুটি পুরস্কার ঘোষণা করেন—প্রথমটির মূল্য পাঁচ হাজার পাউণ্ড, দ্বিতীয়টির মূল্য দু'হাজার। ক্যালিফোর্ণিয়া থেকে হাওয়াই পর্য্যন্ত একটানা উড়ে আসবার জন্যই এই পুরস্কার। এই বিমান-প্রতি-যোগিতায় পনেরো জন বৈমানিক নাম দেন, কিন্তু উঠবার সময়ে আটজনের বেশি পাওয়া যায় নি। তাঁদের ভিতরে দু'জন মাত্র সফল হয়েছিলেন। দু'জন বৈমানিক উড়তে গিয়ে প্লেন ভেঙ্গে মারা যান। দু'খানি বিমান ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত অক্‌ল্যাণ্ডে ফিরে আসে এবং বাকী দু'খানির কোন উদ্দেশই আর মেলে নি।

এর পরেই মনে পড়ে এ্যামেলিয়ার কথা। ১৯৩৫ সালে তিনি অক্‌ল্যাণ্ড থেকে একটানা ২৪০০ মাইল উড়ে হনলুলুতে পৌঁছেন। তাঁর সময় লেগেছিল মাত্র সওয়া আঠারো ঘণ্টা। কয়েক মাস পরেই তিনি মেক্সিকো সিটি থেকে আকাশপথে নিউইয়র্ক পর্য্যন্ত যান। পথের মাঝে দশহাজার ফুট পাহাড় মাথা উঁচু ক'রে ছিল। তাও তাঁকে পার হতে হয়েছে।

এ্যামেলিয়ার শেষ ইতিহাস বড় করুণ। পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে গিয়ে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে একদিন অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যান। আজ পর্য্যন্তও কোন খোঁজ মেলে নি।

বহুবার তিনি আকাশে উড়েছেন, বহু বাজি জিতেছেন, বহু রেকর্ড করেছেন। তাঁর শেষ প্রচেষ্টা ছিল, বিমানযোগে পৃথিবী ঘুরে আস্‌বেন। নানা রকমের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়ে প্লেনখানি বোঝাই করা হ'ল। বিমানের কর্ণধার হ'লেন সুদক্ষ বৈমানিক ক্যাপটেন নূনান।

১৯৩৭ সালের পয়লা জুন। ফ্লোরিডার অন্তর্গত মিয়ামি থেকে তাঁদের যাত্রা সুরু হয়। সেখান থেকে ভেন্‌জুয়েলা। তার পরে এল ডাচ্ গায়েনা, এল ব্রেজিল। সেখান থেকে দক্ষিণ আটলান্টিক পার হয়ে তাঁরা এলেন সেনিগাল-এ। ১৭ই তারিখে তাঁরা এসে পৌঁছলেন কলকাতায়। কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর। মাঝখানে আবার রেঙ্গুন পর্যান্ত এক কে, এল্, এম্ প্লেনের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা চলল। এ্যামেলিয়াই অবশ্য জিতেছিলেন। সেখান থেকে অষ্ট্রেলিয়ার ডারউইন্। তারপর এল নিউগিনি। ২রা

জুলাই তাঁরা নিউগিনির লে-সহর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিলেন। গন্তব্যস্থল হ'ল হাউল্যাণ্ড দ্বীপ—আড়াই হাজার মাইলের পথ। কিন্তু লে ছাড়বার পর আর তাঁদের দেখা মেলে নি। সেই দিনই দিবাবসানের দিকে বেতারে ছোট একটি সংবাদ পাওয়া গেল।—"চারদিকে কোথাও তীরের চিহ্ন নেই। যা পেট্রোল অবশিষ্ট আছে তাতে আর মাত্র আধঘণ্টা ওড়া চলবে।" এর পরে আর তাঁদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।

যখন বোঝা গেল যে, এ্যামেলিয়া বিপদে পড়েছেন তখন যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেণ্ট প্রাণপাত ক'রে অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন। বন্দরে যতগুলো জাহাজ ছিল সবাইকে পাঠানো হ'ল হাউল্যাণ্ড দ্বীপের এলাকায়। ড্রেষ্ট্রয়ার এবং ব্যাটলসিপ কলোরেডোকেও পাঠানো হ'ল এই কাজে। আটখানা এরোপ্লেন নিয়ে বিমান-বাহী জাহাজ লেক্‌সিংটনও চ'লে এল। ষাটখানা বিমান হাজার হাজার মাইল ধ'রে তন্ন-তন্ন করে খোঁজ করতে লাগল। পরের দিন আবার নূতন ক'রে খোঁজ আরম্ভ হ'ল। এবারে গেল চল্লিশখানা প্লেন। কিন্তু কোথায় বা এ্যামেলিয়া আর কোথায় বা তাঁর এরোপ্লেন! চারদিকে শুধু নীল জল সূর্য্যের কিরণে ঝিক্‌মিক্ করছে—যেন অনুসন্ধানকারীদের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে।

এ্যামেলিয়া, সবার প্রিয় এ্যামেলিয়া আকাশ জয় করতে চেয়েছিলেন। সেই আকাশের বুক থেকেই একদিন অতি অকস্মাৎ তিনি মিলিয়ে গেলেন! সেদিন প্রশান্ত মহাসাগরের

স্তব্ধ অতল জল কি একটুও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে নি? হয়ত উঠেছিল, কে জানে?

এর পরে এল দেশ-বিদেশে পাড়ি দেবার পালা। দুস্তর প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে আমেরিকা থেকে অষ্ট্রেলিয়ায় প্রথম উড়ে যান অষ্ট্রেলিয়ান বৈমানিক ক্যাপ্টেন কিংস্‌ফোর্ড স্মিথ। তাঁর প্লেনের নাম ছিল সাদার্নক্রশ—মাঝারি গোছের একখানি মনো-প্লেন। ১৯২৮ সালের মে মাসের শেষ দিনটিতে তিনি অক্‌ল্যাণ্ড থেকে যাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন তিনজন আরোহী—একজন বিমানচালক, একজন নাবিক এবং একজন বেতার-পরিচালক। প্রায় আড়াই হাজার মাইল পার হয়ে তাঁরা হনলুলুতে এসে হাজির হলেন। অক্‌ল্যাণ্ড থেকে হনলুলু অনেকেই উড়ে এসেছেন, তাই স্মিথের এই সাফল্যে কেউ বিশেষ উৎসাহ দেখালেন না। কিন্তু তার পরেই এল বিপদসঙ্কুল পথ। হনলুলু থেকে ফিজি দ্বীপপুঞ্জ—তিন হাজার মাইলেরও বেশি পথ। মাঝখানে আবার ইঞ্জিন একটি বিগড়ে গেল। প্রবল বাতাস উল্টো দিকে বইছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আর বাতাসের ঘূর্ণাবর্ত্ত। প্রতিটি মুহূর্ত্ত তাঁদের সশঙ্ক থাকতে হয়েছে। এই রকম উদ্বেগ ও বিপদের মধ্য দিয়ে তাঁরা পৌঁছুলেন ফিজি দ্বীপের সুবা নগরীতে। সেখান থেকে ফের দৌড় দিতে হ'ল ব্রিস্‌বেনের দিকে। বাতাসের ঘুর্ণিতে প'ড়ে প্লেন তো নাজেহালের একশেষ। ক্রমে অষ্ট্রেলিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উড়ে এলেন। তখনও বিরাম নেই।

তাঁরা ঠিক করলেন টাসম্যান সাগর পার হয়ে নিউজিল্যাণ্ডে পৌঁছুবেন।

এই যাত্রাটি তাঁদের পক্ষে প্রাণান্তকর হয়েছিল। মেঘের মধ্য দিয়ে যেতে তাঁরা বৈদ্যুতিক ঝড়ের মুখে পড়েন। প্লেনের চারদিকে বিদ্যুতের হল্‌কা চমক দিচ্ছে। এর ভিতর দিয়ে তাঁদের পাড়ি জমাতে হয়েছে।

এপর্য্যন্ত যত লোক প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়েছেন তাঁদের সবার রেকর্ড ভঙ্গ ক'রে নূতন রেকর্ড স্থাপন করলেন দু'জন বৈমানিক ক্লাইড প্যাংবর্‌ন্‌ এবং হিউজ হার্নডন। এক ইঞ্জিনের ছোট্ট একখানি প্লেন, মিষ্টি একটি নাম, মিস্‌ ভিডোল। তাঁরা জাপানের সামিসিরো উপকূল থেকে একটানা উড়ে মাত্র এক-চল্লিশ ঘণ্টার ভিতরে ওয়াশিংটনে এসে পৌঁছান। দীর্ঘ সাড়ে চার হাজার মাইলের এই পথ অতিক্রম ক'রে তাঁরা পাঁচ হাজার পাউণ্ডের এক পুরস্কার লাভ করেন। এখানে বলা যেতে পারে যে, এই ঘটনার ন'বছর আগে ক্যাপ্‌টেন রস্‌ স্মিথ লণ্ডন থেকে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত উড়ে গিয়ে দশ হাজার পাউণ্ডের এক পুরস্কার পান। তখন সময় লেগেছিল সাতাশ দিন এবং সেদিনকার লোক এই গতিকেই তড়িৎ গতি ব'লে ভেবেছিল। এত অল্প সময়ের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাওয়া কত বড়ই না বিস্ময়ের বস্তু ছিল!

আট বছর পরেই বার্ট হিন্‌কলার এই গৌরব ম্লান ক'রে দেন। তিনি মাত্র সাড়ে পনের দিনে লণ্ডন থেকে অষ্ট্রেলিয়ার

উপস্থিত হন। এই থেকেই হিন্‌ক্‌লারের রেকর্ড কববার নেশা চেপে যায়। পাঁচ বছর পরে ইংলণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে নতুন রেকর্ড করতে গিয়ে তিনি প্রাণ দেন। ১৯৩৩ সালের ৭ই জানুয়ারী তিনি ইংলণ্ড থেকে রওনা হ'ন; কিন্তু তারপর বহুদিনের মধ্যে তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি। প্রতীক্ষায় দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল—কিন্তু তাঁর আর দেখা মেলে না। দীর্ঘ চার মাস পরে এক পর্ব্বতকন্দরে তাঁর দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। হিন্‌ক্‌লার রেকর্ড করেছিলেন ১৯২৮ সালে। বহুদিন পর্য্যন্ত কেউ তাঁর সেই রেকর্ড ভাঙ্গতে পারেন নি। ১৯৪০ সালে একজন মহিলা বৈমানিক এমি জনসন তাঁর এরোপ্লেন যেসন-এ করে এই রেকর্ড ভঙ্গ করার চেষ্টা করেন কিন্তু বিলাতে ক্রয়ডন এরোড্রোম থেকে অষ্ট্রেলিয়ার পোর্ট ডারউইন পর্য্যন্ত যেতে তাঁর সাড়ে উনিশ দিন সময় লাগে। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে হয়ত তিনি হিন্‌ক্‌লারের রেকর্ড ভঙ্গ করে নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করতে পারতেন।

ইংলণ্ড থেকে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত যত বিমান-প্রতিযোগিতা হয়েছে তাদের মধ্যে সব চাইতে নামকরা হ'ল ম্যাক রবার্টসন প্রতিযোগিতা। রবার্টসন ছিলেন অষ্ট্রেলিয়াবাসী এক মিষ্টব্যবসায়ী। তাঁরই উদ্যোগে এই আকাশ-বাজির আয়োজন হয়। প্রতিযোগিতায় চৌষট্টীজন নাম দেন, কিন্তু কাজের বেলায় বিশজনের বেশি লোক পাওয়া যায় নি। ততদিনে এমি জনসনের জেমস্ মলিসন নামে এক বৈমানিকের সাথে বিয়ে হয়ে

যায়। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী এই প্রতিযোগিতায় খুব নাম করেন। তাঁরা বাজি জিততে পারেন নি, এমন কি শেষ পর্য্যন্ত যেতেও পারেন নি, তা'হলেও লণ্ডনের কাছাকাছি মিল্‌ডেনহল এরোড্রোম থেকে একটানা বাগদাদ পর্য্যন্ত উড়ে গিয়ে তাঁরা রেকর্ড করেন।

এই বাজি জিতেছিলেন দু'জন বৈমানিক—স্কট এবং ক্যাপটেন ক্যাম্পবেল ব্ল্যাক। বাগদাদ পর্য্যন্ত তাঁরা পিছনেই প'ড়ে ছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে এলাহাবাদের মধ্যেই তাঁরা মলিসন-দম্পতিকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যান। মলিসনরা এলাহাবাদেই ক্ষান্ত দিলেন।

এদিকে স্কট এবং ব্ল্যাক এগিয়ে চলেছেন। ক্রমে বঙ্গোপসাগর এসে গেল। আবহাওয়ার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। এত খারাপ যে তাঁরা বেশি উপরে উঠতে ভরসা পেলেন না; জলের সামান্য একটু উপর দিয়ে তাঁদের বিমান চালাতে হচ্ছিল। তারপর যখন সিঙ্গাপুর ছেড়ে অষ্ট্রেলিয়ার ডারউইনের দিকে রওনা হলেন তখন আকাশের অবস্থা আরও খারাপ। অস্বচ্ছ কুয়াসায় চারিদিক ঢাকা। যন্ত্রের উপর নির্ভর করা ছাড়া আর পথ রইল না। এদিকে এই বিপদ, তার উপর আবার টাইমর সাগর পার হবার সময় ইঞ্জিনটি গেল খারাপ হয়ে। এসত্ত্বেও তাঁরা কোন মতে ডারউইন বন্দরে এসে পৌঁছলেন। সেখানে জখমী প্লেনখানাকে ভাল ক'রে মেরামত করা হ'লে তাঁরা মেলবোর্ণের উদ্দেশে পাড়ি দিলেন। বারো হাজার তিনশ' মাইলের এই

দুস্তর পথ অতিক্রম করতে তাঁদের সময় লেগেছিল মাত্র একাত্তর ঘণ্টা—পূরো তিনটি দিনও নয়।

এই দৌড়ের বাজিতে যাঁরা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন, কতগুলো কারণে তাঁদের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৈমানিক দু'জন, মল এবং পারমেন্টিয়ার কোন বিশেষ ধরণের প্লেন নিয়ে এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেন নি। তাঁর একখানা ডাক এবং যাত্রীবাহী সাধারণ কে, এস্, এম্ প্লেন ব্যবহার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, সঙ্গে ছিল তিনজন মাল্লা, তিনজন যাত্রী এবং ত্রিশ হাজার চিঠি। এইসব চিঠি বিলি করবার জন্য তাঁরা আঠারোটা বিমান-ঘাঁটিতে নেমেছিলেন। এত ক'রেও তাঁদের লেগেছিল মাত্র নব্বই ঘণ্টা আঠারো মিনিট। এই সব ভেবে দেখলে মনে হয় স্কট এবং ব্ল্যাকের চাইতে এঁদের কৃতিত্বও কম নয়।

এই দৌড়ের বাজিতে দু'জন বৈমানিক রোমের কাছাকাছি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান।

বিশাল চীন এবং অরণ্যময় আফ্রিকা অভিযান

বিমানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নানা অজানা দেশ জানবার সুযোগ হয়েছে। বহুকাল থেকে আফ্রিকার অরণ্যশ্রেণীর ভিতর দিয়ে দুঃসাহসী আবিষ্কারকেরা নতুন দেশের সন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন। কেউ বা ফিরেছেন, কেউ বা ফেরেন নি। সেখানকার

সহস্র বিপদ, অসংখ্য রোগ, অসভ্য এবং অর্দ্ধসভ্য অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাঁদের পথ চলতে হয়েছে। কেউ বা সেই অন্ধকার অরণ্যের ভিতরে হিংস্রশ্বাপদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন, কারুকে বা জঙ্গলীরা পুড়িয়ে মেরেছে। তাঁদের অনেকের খবর আমরা জানি, আবার অনেকের খবরই হয়ত আমাদের কাছ পর্য্যন্ত এসে পৌঁছায় নি। কিন্তু আকাশে ওড়বার কৌশল আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই সেই অন্ধকার দেশের উপরে নতুন আলো ফেলবার সুবিধা হ'ল।

বেলুনে ক'রে আফ্রিকা ভ্রমণের এক রোমাঞ্চকর কল্পিত উপন্যাস লিখে গেছেন ফরাসী ঔপন্যাসিক জুল্-ভার্ণ। কি ক'রে রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটির উদ্যোগে ডাঃ ফারগুসন পাঁচ সপ্তাহে আফ্রিকা পরিভ্রমণ ক'রে এসেছিলেন সেই বিবরণ পড়তে পড়তে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। তখন বেলুন আবিষ্কার হয়েছে, কিন্তু বেলুনে ক'রে যে এতবড় বিশাল দেশ ভ্রমণ করা যেতে পারে সে-কথা কেউ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে নি। কিন্তু এতো গেল গল্পের কথা। এখন এরোপ্লেনের এই কাজ অতি সহজেই সম্পন্ন হয়েছে।

ইম্পিরিয়্যাল এয়ার ওয়েজের বহুদিন থেকেই ইচ্ছা ছিল যে, তাঁরা কাইরো থেকে কেপ্‌টাউন পর্য্যন্ত বিমানপথ খুলবেন। সেইজন্য সমস্ত দেশটাকে তন্ন-তন্ন ক'রে পর্য্যবেক্ষণ করা দরকার। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁরা এ্যালান কবহ্যাম নামে একজন বৈমানিককে এই দুরূহ কাজে নিযুক্ত করলেন।

কবহ্যামও এই কাজ খুবই সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। তিনি এই যাত্রায় অসংখ্য ছবি তুলেছিলেন। আফ্রিকার নির্ভুল মানচিত্র তৈরী করতে এই ছবিগুলো যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কবহ্যাম কোন তাড়াহুড়া করেন নি। দরকারমত স্থানে স্থানে বিশ্রাম করেছেন। কোথায় কোথায় বিমান অবতরণ করা সুবিধাজনক, ঘুরে ঘুরে তাও দেখেছেন। এই সাড়ে আট হাজার মাইলের পথ জরীপ করতে সবশুদ্ধ তাঁর সময় লেগেছিল তিনমাস। তবে এর ভিতরে প্রায় সবটাই ব্যয় হয়েছে নানা রকম পর্য্যবেক্ষণের কাজে। উড়তে সময় লেগেছিল মোটে চুরানব্বই ঘণ্টা!

এর পরের বছর কবহ্যাম সস্ত্রীক আফ্রিকা পর্য্যবেক্ষণে যান। এবারে সমস্ত কাজ শেষ ক'রে ফিরে আসতে তাঁর সময় লেগেছিল সাত মাস।

কিন্তু আফ্রিকা পার হওয়া নিয়ে বাজিও ধরা হয়েছে অনেক বার। যাঁরা কেপ্‌টাউন পর্য্যন্ত দৌড়ের পাল্লায় রেকর্ড করেছেন তাঁদের ভিতরে সব চাইতে নামকরা হলেন জেমস্ মলিসন এবং এ্যামি জনসন্। এ্যামির সঙ্গে মলিসনের বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু সে বন্ধন বেশীদিন স্থায়ী হয় নি। আবার তাঁরা আলাদা হলেন। ১৯৩২ সালের মার্চ্চ মাসে চারদিন সাড়ে সতেরো ঘণ্টায় ইংলণ্ড থেকে কেপ্‌টাউন পর্য্যন্ত একটানা উড়ে গিয়ে মলিসন এক রেকর্ড সৃষ্টি করেন। কিন্তু সেই বছরই নভেম্বর মাসে এ্যামি তাঁর রেকর্ড ভেঙ্গে দেন। তাঁর সময় লেগেছিল

চারদিন পৌনে এগার ঘণ্টা। এ্যামি কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট হলেন না; ঠিক করলেন, নিজের রেকর্ড ভেঙ্গে আবার নতুন রেকর্ড করবেন। তু'বছর পরে মাত্র তিন দিন সাড়ে ছ'ঘণ্টায় এত দীর্ঘপথ উড়ে গিয়ে তিনি বিস্ময়কর রেকর্ড স্থাপন করলেন।

অন্যান্য দেশের তুলনায় অন্য দেশ থেকে চীন পর্য্যন্ত যাত্রী-চলাচল সুরু হয়েছে অনেক দেরীতে। মাত্র অল্প কয়েক বছর হ'ল আমেরিকা থেকে চীনে নিয়মিতভাবে আকাশপথে যাত্রী যাওয়া-আসা করছে।

তুষারের দেশ—মেরুমণ্ডল অভিযান

চিরতুষারের রাজ্য মেরু-প্রদেশের মত রহস্যময় আর কোন দেশ আছে কিনা আমরা জানি না। যেদিকে তাকাই কেবল বরফ আর বরফ। ধূ-ধূ করছে সীমাহীন বরফের রাশি। ক্বচিৎ যদি সূর্য্যের দেখা মেলে তবে মর্ম্মর পর্ব্বতের মত সেই বিশাল মেরু-রাজ্য সোনালি আলোয় ঝলমল ক'রে ওঠে। কখনও কখনও নীলোজ্জ্বল এক নৈসর্গিক আলোতে চারদিক হঠাৎ যেন কেমন মায়াময় মনে হয়।

মেরুজয়ের কল্পনা মানুষের অনেক দিনের। বহুকাল আগে থেকেই শুধু পায়ে হেঁটে মানুষ মেরু-দেশের ঘুমন্ত রাজ্যে রওনা হয়েছে। কত লোক নির্ম্মম শীতে প্রাণ দিয়েছে তার আর ইয়ত্তা নেই। ক্রমে বেলুনের আবিষ্কার হ'ল। মানুষ চেষ্টা

ডগলাস মসন । পৃঃ ৮৯

(ইং ১৯১১ সালে দক্ষিণ মেরু অভিযানের নেতৃত্ব করেন)

করল বেলুনে ক'রে সে এই দুর্গম পথ পার হবে ; কিন্তু তা করতে পারে নি। জাহাজে ক'রে বহুদিন থেকেই চেষ্টা চলেছে, সে চেষ্টা অতি অল্প ক্ষেত্রেই পূরোপূরি সার্থক হয়েছে। তারপরে এল এয়ার-সিপ, এল এরোপ্লেন। আমরা শুধু আকাশপথে মেরু-অভিযানের কথাই এখানে বলব। এই কাহিনী একদিকে যেমন বীরত্বে পূর্ণ, তেমনি আবার আত্মোৎসর্গের বেদনায় করুণ।

মেরু-অভিযানের ইতিহাস অত্যন্ত দীর্ঘ, তাই আমরা এর মোটামুটি কাহিনী বলব। এরোপ্লেনে ক'রে সর্ব্বপ্রথম উত্তর মেরু ভ্রমণ ক'রে এসেছেন আমেরিকার সমর বিভাগের কমাণ্ডার বার্ড। ১৯২৬ সালের ৯ই মে বেনেট নামে একজন সহকারী নিয়ে তিনি উত্তর মেরু ঘুরে এসেছেন। এর দু'দিন পরেই তিনজন আবিষ্কারক আমুন্ড্‌সেন, জেনেরাল নোবিল এবং লিন্‌কন্‌ এলস্‌ওয়ার্থ নর্জ নামে একখানা এয়ার-সিপে ক'রে মেরু-অভিযান করেছিলেন।

তার বছর দু'এর মধ্যে আর বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য অভিযান হয় নি, ১৯২৮ সালে জেনেরাল নোবিল ইতালিয়া নামে একখানা এয়ার-সিপে ক'রে দ্বিতীয় বার মেরু যাত্রা করেন। কিন্তু রওনা হবার পরের দিনই এয়ার-সিপখানা বরফের উপরে প'ড়ে চুরমার হয়ে যায়। এই ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে ওর ভিতরে যে গ্যাস-ভর্ত্তি বেলুন ছিল সেটি সাতজন মাল্লা নিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল তার আর খোঁজই পাওয়া গেল না! কিন্তু

যাঁরা বাকী ছিলেন (তাঁদের মধ্যে নোবিলও ছিলেন) তাঁরা দিন পনেরো পরে বাইরের জগতের সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ করতে সমর্থ হলেন। তাঁরা বিপন্ন---এই খবর পেয়ে, আমুন্ডসেন একখানা এরোপ্লেনে ক'রে তাঁদের উদ্ধার করতে যান। কিন্তু তিনি তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌছুতে পারেন নি। আগেই তুষার-রাজ্যের কোথায় তিনি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন আজও পর্য্যন্ত সে খবর কেউ পায় নি। নোবিল কিন্তু রক্ষা পেয়ে যান। একখানা সুইডিস্ বিমান তাঁকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসে।

মেরু-অভিযানের ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়া গোড়া থেকেই খুব আগ্রহশীল। মেরু জয় করবার জন্য বহু বার বহু রকম অভিযান তাঁরা পাঠিয়েছেন। সে সব বৃথা যায় নি। ১৯২৬ সালের গোড়ার দিকেই রাশিয়া ঘোষণা করে যে, তার দেশের মাথার উপরে মেরু-প্রদেশের যতটুকু অংশ সেটুকু তার নিজের। এতে তখন কেউই আপত্তি করে না। হয়ত তা'রা ভেবেছিল মেরুর দেশ শুধু বরফের রাজ্য, সে জায়গা থাকলেই বা কি আর না থাকলেই বা কি? কিন্তু আজ তারা বুঝতে পেরেছে রাশিয়া মেরু-অংশ দাবী করেছেন কেন! আজ জানা গেছে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা এই মেরু-দেশ—কতরকম খনিজ জিনিষ, তৈল, লোহা, কয়লা আরও কত কি আছে সেখানে! বর্ত্তমান সভ্য-জগতে এই সব জিনিষের যে কি মূল্য তা আমরা জানি। কিন্তু মেরু-অভিযানে আরও উদ্দেশ্য ছিল। সোভিয়েট গভর্ণমেণ্টের বরাবরই ইচ্ছা ছিল মেরু-দেশের উপর দিয়ে আমেরিকার সাথে

বিমানযোগ স্থাপন করবে। তাতে সময় এবং পথ ছুই-ই বাঁচবে অনেকখানি। দ্বিতীয়তঃ মেরু-রাজ্যকে ভাল ক'রে সুরক্ষিত করতে না পারলে ভবিষ্যতে ঐ পথে বিমান আক্রমণের সম্ভাবনা থাকবে প্রচুর। তা' ছাড়া আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। সেটি হ'ল মেরু-প্রদেশের আবহাওয়ার খবর জানা। নিছক জ্ঞানের জন্যই যে আবহাওয়াব খবর জানা দরকার তা নয়। মেরুর উপর দিয়ে বিমান চালনা করতে হলে সেখানকার আবহাওয়ার খবর না জানলে কিছুতেই চলবে না। ঝড়বৃষ্টিব দুর্যোগের জন্য কত যে জাহাজ এবং এরোপ্লেন ধ্বংস হয়েছে সেখানে তার আর ইয়ত্তা নেই! শুধু তাই নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর আমাদের জীবনযাত্রার অনেক কিছুই নির্ভর করে। এমন কি, ক্ষেতের ফলও কি রকম হবে তাও নির্ভর করে আবহাওয়ার গতির উপর।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, আবহাওয়ার যত কিছু বিপর্য্যয় ঘটে তার সব কিছুরই উৎস হ'ল মেরু-দেশ। সেই জন্যই মেরু-অভিযানের মূল্য এত বেশী।

১৯৩২ সালে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট মেরু-অভিযানের জন্য চেলুস্কিন নামে একখানা জাহাজ পাঠান। কিন্তু সে তার গন্তব্য স্থলে পৌঁছুতে পারে নি। তখন প্রচণ্ড শীত। একদিন শেষ-রাত্রি থেকেই প্রবলবেগে ঝড় আরম্ভ হ'ল। কুয়াসা এবং জলীয় বাষ্পে সমস্ত আচ্ছন্ন। অবিরাম জাহাজের উপর বরফ পড়তে লাগল। জাহাজের উপর ক্রমে বরফের স্তূপ জমে উঠল।

কিন্তু উন্মত্ত ঝড়ের তখনও বিরাম নেই। তখনও বরফ সমান ভাবে পড়ছে। বরফের দারুণ ভারে জাহাজের খানিকটা ভেঙ্গে গেল। হুহু ক'রে জল ঢুকছে সেই ছিদ্রপথে। আর জাহাজ রক্ষার কোন উপায় নেই। একটু একটু ক'রে জাহাজখানা জলের তলে মিশিয়ে গেল। উপরে রইল সীমাহীন বরফের স্তূপ আর বাতাসের ক্রুদ্ধ গর্জ্জন। জাহাজের আরোহীদের মধ্যে একজন বাদে সবাইকেই এরোপ্লেনের সাহায্যে উদ্ধার করা হয়েছিল। কাগজপত্রও কিছুই নষ্ট হয় নি। এইটাই ছিল মস্ত লাভ।

এর প্রায় তিন বছর পরে আবার নতুন ক'রে মেরু জয়ের আয়োজন করা হয়। ঠিক হ'ল উত্তর মেরু থেকে ছ'শ মাইল দূরে রুডল্‌ফ্ দ্বীপ থেকে অভিযান আরম্ভ হবে। কাজে কাজেই ১৯৩৬ সালের মাঝামাঝি থেকেই ঐ দ্বীপের উপর নানা রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বসানো হ'ল। বসানো হ'ল বিমান-ঘাঁটি। দেখতে দেখতে বেতার-কেন্দ্র এবং আবহাওয়া অফিসও স্থাপিত হ'ল সেখানে। দ্বীপটি এবারে দেখতে হ'ল ছোটখাট একটি সহরেরই মত।

এদিকে এই অভিযানের জন্য চারখানা বিশেষ ধরণের এরোপ্লেন বেছে নেওয়া হ'ল। অত শীতেও যাতে এঞ্জিন চালু থাকে তার জন্য এঞ্জিনের গায়ে লাগিয়ে দেওয়া হ'ল নতুন ধরণের এক ঢাকনা। নতুন রকমের বিমান চালনার যন্ত্রও নিতে হ'ল; কারণ সাধারণতঃ চুম্বক দিয়ে তৈরী কম্পাস দিয়েই চালকেরা

দিক ঠিক করেন। কিন্তু এখানে তাঁরা চলেছেন উত্তর মেরুতে। মেরু যে শুধু মাত্র পৃথিবীরই মেরু তাই নয়, পৃথিবী যে বিরাট এক চুম্বক তারও একপ্রান্ত ঐখানে। তাই সেখানে সাধারণ কম্পাসের চুম্বক যে কি রকম ব্যবহার করবে তার কিছুই ঠিক নেই। শুধু এই ক'রেই তাঁরা ক্ষান্ত হলেন না। সাদা বরফের পটভূমিকায় এরোপ্লেনগুলোকে যাতে স্পষ্ট দেখা যায় তার জন্য তাদের কমলালেবুর মত রং করা হ'ল। বরফের সাদার উপরে এই রং বেশ স্পষ্ট এবং পরিষ্কার দেখা যাবে।

সমস্ত আয়োজন সারা করতে ১৯৩৭ সালের মার্চ্চ মাসের আধাআধি কেটে গেল। তারপর ২২শে মার্চ্চ প্লেন ক'খানি রওনা হ'ল রুডল্‌ফ্ দ্বীপের দিকে।

পরে আর্কেঞ্জেল, নোভিয়া, জেমেলিয়া প্রভৃতি জায়গা পার হয়ে তাঁরা ১৮ই এপ্রিল এসে পৌঁছুলেন রুডল্‌ফ্ দ্বীপে। দ্বীপ-নগরীর অধিবাসীরা তাঁদের অভিনন্দিত করল।

তারপর কয়েকদিন ধ'রে আবহাওয়া সম্বন্ধে নানা রকম খোঁজ-খবর চলল। প্রফেসর অটো স্মিড্ ছিলেন এই দলের কর্ত্তা।

৫ই মে USSR N-166 নামে একখানা এরোপ্লেন রুডল্‌ফ্ দ্বীপ থেকে যাত্রা করল মেরুর উদ্দেশে। প্লেনখানি নির্ব্বিঘ্নে মেরুর উপর দিয়ে ঘুরে এল। আবহাওয়া খারাপ থাকায় সেখানে নামতে পারে নি। ছ'দিন পরে আর একখানি প্লেন পাঠানো হ'ল। প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে এখানাকেও ফিরে

আসতে হ'ল। তবে সে রুডল্‌ফ্ দ্বীপের ঘাঁটি পর্য্যন্ত এসে পৌঁছুতে পারে নি; সেখান থেকে পঁয়ষট্টি মাইল দূরে এক জায়গায় নেমে পড়তে বাধ্য হয়। সাধারণ জমি সেখানে ছিল না, তাই বড় দেখে একটা বরফের স্তূপের উপরেই প্লেনখানাকে নামতে হয়। তখন আরম্ভ হ'ল প্রবল ঝড়—সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। একদিন যায়, দু'দিন যায়, ঝড় আর থামে না। প্রবল শীতে গা-হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। তবু ঝড় এবং তুষারবৃষ্টির বিরাম নেই। এত বিপদের মধ্যেও প্লেন আরোহীরা রুডল্‌ফ্ দ্বীপের সঙ্গে বেতাবের যোগ রেখেছিলেন।

চার দিনের দিন, রুডল্‌ফ্ দ্বীপের ঘাঁটি থেকে একখানা প্লেন এসে প্যারাস্যুটে ক'রে কিছু খাবাব ও পোষাক-পরিচ্ছদ ফেলে দিয়ে গেল। এদিকে এই দুর্য্যোগের মধ্যে N-66 আকাশেও উঠতে পারছিল না। কি জানি উঠবার সময়ে যদি বরফের স্তূপ ভেঙ্গে যায়, তা হলে ত প্লেন ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যাবে।

আরও তিন দিন গেল। অবস্থার একটুও উন্নতি হ'ল না এবং আবহাওয়া আরও খারাপের দিকেই যাচ্ছে। এদিকে বিপদের উপর বিপদ। যে স্তূপের উপর তাঁরা নেমেছিলেন সেটি হঠাৎ গলতে সুরু করল। এবারে আর উদ্ধার নেই। তাই তাঁরা মরিয়া হয়ে রুডল্‌ফ্ দ্বীপের দিকে যাত্রা করলেন এবং আশ্চর্য্যের ব্যাপার, নির্ব্বিঘ্নেই এসে ঘাঁটিতে পৌঁছুলেন।

এই সাত দিনের অভিজ্ঞতায় ভবিষ্যতে তাঁদের অনেক উপকার হয়েছিল। ২১শে মে তেরজন আরোহী নিয়ে আর

একখানি প্লেন USSR N-170 মেরুযাত্রা করে। এ যাত্রার আরম্ভ থেকেই আকাশ-বাতাসের অবস্থা ছিল অত্যন্ত প্রতিকূল। যাঁরা রুডল্‌ফ্‌ দ্বীপে রইলেন, তাঁরা ভীড় ক'রে দাঁড়ালেন বেতার ঘাঁটির সামনে—কখন কি খবর আসে এই ভরসায়।

সময় বয়ে চলেছে। হঠাৎ বেতার যন্ত্রের কল বেজে উঠল। বেতার-চালক চকিত হয়ে উঠলেন। হ্যাঁ, N-170 থেকেই খবর আসছে!...কিন্তু একি! হঠাৎ খবর পাঠানো বন্ধ হয়ে গেল যে! কই না, আর ত কিছু শোনা যাচ্ছে না!

তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, আর কোন সংবাদ আসে না। এদিকে মস্কো থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেতার যোগে কৈফিয়ৎ তলব করা হতে লাগল, কেন এই দুর্যোগের মধ্যে N-170কে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অধীর প্রতীক্ষায় দশ ঘণ্টা কাটল। হঠাৎ আবার কল বেজে উঠল—"N-170 থেকে বলছি। সবাই ভাল আছে।"

একটু পরেই N-170 থেকে সরকারী ভাবে বেতারযোগে প্রচার করা হ'ল—"বেলা এগারোটা দশ মিনিটের সময় প্রোফেসর স্মিডের তত্ত্বাবধানে আমরা উত্তর মেরুতে এসে পৌঁছেছি। পাইলট ভোডোপিয়ানফ্‌ নামবার আয়োজন করলেন। পাঁচ হাজার ফুট থেকে আমাদের বিমান ছ'শ ফুটের ভিতর নেমে এল। চারদিকে মেঘ ও কুয়াসার জাল ছড়িয়ে আছে। পাইলট উত্তর মেরু থেকে বিশ কিলোমিটার দূরে একটা বরফস্তূপের উপর এরোপ্লেনখানা নামিয়ে ফেললেন।

প্রথম বারে খবর পাঠাবার সময়ে আমাদের বেতার-যন্ত্র বিকল হয়ে যায়, তাই সম্পূর্ণ খবর তখন পাঠানো সম্ভব হয় নি।"

মেরুজয়ের পরে একটা নতুন ধরণের প্রশ্ন জাগল সবার মনে: মেরু-রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী হবে কে? বিলাতের এক সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে বেতারযোগে প্রোফেসর স্মিডকে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করা হ'ল। তিনি জবাব দিলেন, "যে দেশের নৌবহর সব চাইতে শক্তিশালী সে যেমন সমুদ্রের উপর প্রভুত্ব করে, তেমনি যে দেশের বিমানবহর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে-ই হবে মেরু-রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী।"

উত্তর-মেরুর উপর দিয়ে লম্বা পাড়ি দিয়েছেন রাশিয়ান বৈমানিকেরাই প্রথম। ১৯৩৭ সালের ২০শে জুন তিনজন রাশিয়ান বৈমানিক একটানা তেষট্টি ঘণ্টা উড়ে মস্কো থেকে ওয়াশিংটনের পিয়ার্সন বিমান-ঘাঁটিতে এসে নেমেছিলেন। তাঁরা উড়ে এসেছিলেন মেরুর উপর দিয়ে এবং তাঁদের লক্ষ্য ছিল সানফ্রান্সিস্কো। কিন্তু শেষের দিকে ঘন কুয়াসার জন্য তাঁরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারেন নি। অবশ্য এই যাত্রার ফলে তাঁরা অনেক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।

তারপর এল সেই স্মরণীয় ১৪ই জুলাই, যে দিন রাশিয়ান বৈমানিকেরা বাষট্টি ঘণ্টা উড়ে মেরুপথে মস্কো থেকে ক্যালিফোর্ণিয়ায় এসেছিলেন। সে কাহিনী আমরা গোড়াতেই বলেছি।

উত্তর-মেরুর মত দক্ষিণ-মেরুর অভিযানও কম চমকপ্রদ

নয়। এখানে মেরু-মণ্ডলে পৌঁছিবার বহুরকম চেষ্টা হয়েছে। আমরা শুধু বিমান-অভিযানের কথাই বলব। বিমানে দক্ষিণ-মেরুদেশ পরিভ্রমণ করেন স্যার হিউবার্ট উইলকিন্‌স্ প্রথম। সে হ'ল ১৯১৯ সালের কথা। উইলকিন্‌স্ দক্ষিণ-মেরুর গ্রেহাম ল্যাণ্ড ভাল ক'রে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে এসেছিলেন। লোকজন, নানারকম যন্ত্রপাতি, বিমান এই সব নিয়ে তিনি উইলিয়াম স্কোর্‌স্‌বি নামে একখানা জাহাজে ক'রে যাত্রা করেন। ডিসেপ্‌সন্ দ্বীপে জিনিষপত্র রেখে তিনি প্লেনে ক'রে গোটা গ্রেহাম দেশটা ঘুরে দেখলেন। তখন জানুয়ারী মাস। উড়বার পক্ষে আবহাওয়া অনুকূল নয়। তাই জিনিসপত্র ডিসেপ্‌সন্ দ্বীপে রেখে তিনি এলেন, কিছুদিন পরে আবার সেখানে ফিরে যাবেন ব'লে। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি আবার নতুন উদ্যমে অভিযান সুরু করেন। এই যাত্রায় চারকোটল্যাণ্ড দেখতে গিয়ে তিনি কুয়াসার মধ্যে পড়েন। সামনেই হাজার-হাজার ফুট উঁচু পাহাড়—আর তারই সামনে মেঘ-কুয়াসার শ্বেত আবরণ, কিছুই দেখা যায় না। নিতান্ত দৈবের জোরেই সেবার তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। মেরু-যাত্রার এই সব অভিজ্ঞতা থেকে উইলকিন্‌স্‌এর একটা ধারণা হ'ল যে, মেরুদেশে যদি আবহাওয়ার বিবরণ জানতে যেতে হয় তবে এরোপ্লেনের চাইতে সাবমেরিণে ক'রে যাওয়াই ভাল। তিনি যে শুধু মনে মনে ভেবেই চুপ ক'রে রইলেন তা নয়, দেশে ফিরে গিয়ে তিনি আমেরিকার নৌ-বিভাগের কাছ থেকে একটা

পুরাণো সাবমেরিণ কিনে, তার কিছু কিছু সংশোধন ক'রে কাজের উপযোগী ক'রে নিলেন—জাহাজখানার নাম দিলেন নটিলাস। নটিলাস নিয়ে তিনি উত্তর-মেরুতে গিয়েছিলেন এবং নটিলাসেব সাহায্যে সত্যসত্যই খুব ভাল কাজ করতে পেরেছিলেন।

উইলকিন্‌স্‌এর পরেই মনে পড়ে কমাণ্ডার বার্ডের কথা। উইলকিন্‌স্ যেমন ছিলেন সাদাসিধা, বার্ড ছিলেন আবার তেমনি আড়ম্বরের পক্ষপাতী। লক্ষ-লক্ষ টাকা খরচ ক'রে তিনি অভিযানের আয়োজন করলেন। এই সব ব্যাপারে তিনি ছিলেন খাঁটি আমেরিকান, অত্যন্ত উৎসাহী এবং আশ্চর্য্য রকমে জাঁকজমকের পক্ষপাতী। বার্ড কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করেছেন অনেক। বার্ড তার দক্ষিণ-মেরুযাত্রা সম্বন্ধে বলেছেন, "দক্ষিণ-মেরু জয়ের এখনও কিছুই হয় নি। যে রহস্যের আবরণ একে ঢেকে রেখেছে, তার সামান্য একটু অংশই কেবল আমরা উন্মোচন করতে পেরেছি। এ কাজ শেষ করতে আরও কতদিন লাগবে কে জানে? জানা তো সবে সুরু হয়েছে—"

বার্ডের পরেই এলেন আমেরিকান বৈমানিক এল্‌স্‌ওয়ার্থ। মাঝারি সাইজেব একখানা মনো প্লেন—নাম তার পোল-স্টার, উদ্দেশ্য মেরু অতিক্রম। ১৯৩৪ সালে তিনি বিমানখানাকে ডিসেপ্‌সন্ দ্বীপে নিয়ে যান। সেখান থেকে প্রথম উড়তে গিয়েই বিপদ বাধল। ইঞ্জিনের একটা ডাণ্ডা ভেঙ্গে গেছে। সেখানে ব'সে সারাবারও উপায় নেই। চিলি থেকে দরকারমত

যন্ত্রপাতি আনিয়ে তবে এরোপ্লেন সারানো যায়। এদিকে তাঁর বরাতের গুণে বাতাসের অবস্থাও ভীতিপ্রদ। দিনের পর দিন বাতাস উল্টো দিকে বইছে। আর মাঝে মাঝেই বরফের ঝড়, কুয়াসা, বৃষ্টি এসব তো লেগেই আছে। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী থেকে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত তিনি অপেক্ষা করলেন। এতদিন পরে তাঁর সুযোগ এল। দু'বার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে তিনি মেরু অতিক্রম করবার জন্য লম্বা পাড়ি দিলেন। তাঁর প্লেনে বেতার যন্ত্র ছিল। কিন্তু আকাশে উঠেই সেটি খারাপ হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও তিনি মেরুমণ্ডল পার হয়ে লিট্‌ল্ আমেরিকায় উপস্থিত হ'ন। তাঁর ইচ্ছা ছিল আরও কিছুদূর এগিয়ে যাবেন; কিন্তু তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় তা আর সম্ভব হয় নি। এই পাল্লায় তিনি প্রায় সওয়া দু'হাজার মাইল উড়েছিলেন। পথের মধ্যে নামতে হয়েছিল চারবার। শেষকালে ডিস্‌কভারী টু (Discovery II) নামে একখানা জাহাজ গিয়ে তাঁদের লিট্‌ল্ আমেরিকা থেকে উদ্ধার করে।

১৮৭৩ সালে ফরাসী ঔপন্যাসিক জুল ভার্ণ তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস Round the World in Eighty Days বার করেন। গল্পের নায়ক ফিলিয়াস ফগ নানা রকম বাধা-বিপত্তির ভিতর দিয়েও আশি দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন। তখন সব দেশে রেলপথই ভাল ক'রে প্রচলিত হয়নি। তাই ভার্ণের এই কল্পনাকে সেদিনকার লোক নিতান্ত গল্প-কথা ব'লেই উড়িয়ে দিয়েছিল। তা'রা বিশ্বাস করতে পারে নি যে কোন লোক

আশি দিনের ভিতর পৃথিবীটা ঘুরে আসতে পারে! কিন্তু তারপরে বিশ বছর যেতে না যেতেই যখন নেলী ব্লাই নামে একজন মহিলা মাত্র বাহাত্তর দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ ক'রে এলেন তখন লোকের বিস্ময়ের সীমা রইল না। এর পরে বহুবার পৃথিবী ঘুরে আসবার চেষ্টা হয়েছে। ১৯১৩ সালে, তখনও ভাল ক'রে এরোপ্লেনের প্রচলন হয় নি, নিউইয়র্কের 'ইভিনিং সান্'-এর পক্ষ থেকে জন্ হেনরী মিয়ার্স মাত্র পঁয়ত্রিশ দিনে ভূ-প্রদক্ষিণ ক'রে এলেন। লোকে অবাক্ বিস্ময়ে চেয়ে ভাবল, কালের গতি কোন্ দিকে চলেছে?

এরোপ্লেনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী-ঘোরার পালাটাও অনেকখানি সহজ হয়ে এল। সহজ হ'ল সময়ের দিক দিয়ে, বিপদের দিক দিয়ে নয়। বহু বৈমানিক এই দুরূহ কাজে হাত দিয়েছেন, অনেকে এই চেষ্টায় প্রাণও দিয়েছেন।

আজকাল যে কোন বইয়ের দোকানেই দেখা যাবে রোমাঞ্চকর একখানি বই—"Around the World in Eight Days." জুল ভার্ণের বইর মত এটা গল্প-কাহিনী নয়—উইলী পোষ্টের বিমানে ভূপ্রদক্ষিণের কাহিনী।

বিমানে ক'রে পৃথিবী-ভ্রমণের প্রথম চেষ্টা করেন আমেরিকার সমর-পরিষদ্। ১৯২৪ সালের ৬ই এপ্রিল তাঁরা চারখানা প্লেন পাঠান, উদ্দেশ্য ছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৃথিবী প্রদক্ষিণ সারা ক'রে বৈমানিকরা ঘরে ফিরে আসবেন। পথের মধ্যে তাঁদের নামতে হয়েছে অনেক জায়গায়; বিমান মেরামত

করতে হয়েছে অনেক বার। তাঁদের সময় লেগেছিল একশ' পঁচাত্তর দিন।

এর ঠিক সাত বছর পরে উইলী পোষ্ট এবং তাঁর বন্ধু হ্যারল্ড গ্যাটি এরোপ্লেনে ক'রে পৃথিবী ঘুরে আসবার আয়োজন করলেন। পোষ্ট মিষ্টার হল নামে এক ধনী ব্যবসায়ীর সাহায্য লাভ করেন। তিনি তাঁকে একখানা বিমান ব্যবহার করতে দেন। তাই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ পোষ্ট হলের মেয়ের নামে বিমানখানির নামকরণ করলেন। হলের মেয়ের নাম ছিল উইনি মে-হল, আর প্লেনখানির নাম দেওয়া হ'ল 'উইনি মে'।

১৯৩১ সালের ২৪শে জুন। নিউইয়র্কের রুজভেল্ট বিমান-ঘাঁটি থেকে যাত্রা আরম্ভ হ'ল। আটদিন পনেরো ঘণ্টা একান্ন মিনিটের মধ্যে তাঁরা ভ্রমণ শেষ ক'রে ফিরে এলেন।

ফিরে এসে পোষ্ট ঠিক করলেন এবারে তিনি একাই যাত্রা করবেন এবং তাঁর নিজের রেকর্ডই নিজে ভাঙ্গবেন। যেমন সংকল্প তেমনি কাজ। তিনি হলের কাছ থেকে 'উইনি মে'খানা কিনে নিয়ে সামান্য কিছু অদলবদল ক'রে নিলেন। সঙ্গে একটা নতুন যন্ত্র বসানো হ'ল—অটোমেটিক পাইলট। বিমানচালক ইচ্ছা করলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে নিতে পারেন, এই যন্ত্রই তখন প্লেনকে ঠিকমত পরিচালিত করবে। এই যন্ত্রটি পোষ্টকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। এ যাত্রায় তাঁর সময় লেগেছিল মাত্র সাতদিন আঠারো ঘণ্টা। ১৯৩৫ সালে পোষ্ট ঠিক করেন সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো থেকে সাইবেরিয়ায় উড়ে যাবেন একটানা—কোথাও না থেমে।

আগষ্ট মাস—তখন বেশ গরম। পোষ্ট উইল রোজার্স নামে একজন আমেরিকান ভদ্রলোককে নিয়ে সাইবেরিয়ার উদ্দেশে রওনা হলেন। কিন্তু তিনি তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌছতে পারেন নি। ১৫ই আগষ্ট তাঁর প্লেনখানি আলাস্কার উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় ভেঙ্গে পড়ে। আরোহী দুজনই সঙ্গে সঙ্গে মারা যান। চারদিকে সীমাহীন বরফ ধূ ধূ করছে। তারই উপর বিমানখানি ছোট্ট একটি পাখীর মত নিশ্চল হয়ে রইল।

অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই পোষ্টের ভূ-প্রদক্ষিণের গৌরব ম্লান ক'রে দিলেন হাওয়ার্ড হিউজেজ্। চারজন নিয়ে একখানা লকহীড্ প্লেনে ক'রে তিনি নিউইয়র্ক থেকে যাত্রা করেন। প্যারিস, মস্কো পার হয়ে, ইয়াকুট্স্ক্ ফেয়ার ব্যাঙ্ক্স্ পিছনে ফেলে, মিনিয়া-পোলিকা অতিক্রম ক'রে তিনি নিউইয়র্কে ফিরে এলেন। তাঁর সময় লেগেছিল মাত্র তিন দিন উনিশ ঘণ্টা সতেরো মিনিট—পোষ্টের যে সময় লেগেছিল তার অর্দ্ধেকেরও কম।

এসব তো গেল দুঃসাহসিকের প্রাণপণ চেষ্টা—গৌরবের জয়মাল্য অর্জ্জনের সীমাহীন আগ্রহ। কিন্তু ১৯৩৭ সালের শেষাশেষি যাত্রী নিয়ে পৃথিবী ঘুরে আসার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রথম টিকিট কিনে পৃথিবী ঘুরে আসেন ম্যানিলাবাসী এক ভদ্রলোক। তাঁর টিকেটের দাম লেগেছিল চারশ' একষট্টি পাউণ্ড।

—"Above the storm's career,
Look downward where and hundred realms appear
Lakes, forests, cities, plains extending wide"—

মানুষের রহস্যানুসন্ধানেব প্রবৃত্তি চিরকালের। যা কিছু সে জানে না, তাই সে জানবাব চেষ্টা করেছে; যেখানে তার প্রবেশ নিষেধ, সেইখানেই সে যাবার জন্য প্রাণপণ করেছে। মাটি খুঁড়ে সে পৃথিবীর অন্তস্থল দেখতে চেয়েছে, কিন্তু পারে নি। যতই সে নীচে নেমেছে ততই তাকে অধিকতর উত্তাপের সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। প্রত্যেক দু'শ ফুটে এক ডিগ্রী ক'রে তাপ বাড়ছে। তিন-চার হাজার ফুট নীচে যে গরম তা সহ্য করা মানুষের সাধ্যাতীত। মানুষ তারপর অসীম সাগরের তলায় যেতে চেষ্টা করেছে। ডাক্তার বীব্ লোহার গোলার মধ্যে ব'সে আধ মাইল জলের নীচে নেমেছিলেন কিন্তু তার বেশী আর যেতে পারেন নি। আরও নীচে নামতে হ'লে সমুদ্রতল সম্বন্ধে যে পরিমাণ জ্ঞান এবং যে ধরণের উন্নত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন আজও পর্য্যন্ত মানুষ তা আবিষ্কার করতে পারে নি।

শুধু জল এবং স্থলেই মানুষের চেষ্টা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে নি—নীল আকাশের রহস্যও সে ভেদ করতে চেয়েছে। উপরে, আরও উপরে কি আছে তাই সে জানবে। তখনও বেলুনের আবিষ্কার হয় নি—সেই সময় থেকেই বৈজ্ঞানিকেরা উর্দ্ধাকাশের খবর জানতে চেষ্টা করেছেন। খুব বড় বড় ঘুড়ির সঙ্গে থার-মোমিটার এবং আরও নানা রকম দরকারী যন্ত্রপাতি বেঁধে তাঁরা

আকাশে উড়িয়ে দিয়েছেন। ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার উইলসনই ছিলেন এই কাজে অগ্রণী।

তারপরে বেলুন আবিষ্কৃত হ'ল। মানুষ বেলুনে চ'ড়ে উড়ে বেড়াতে শিখল। তখন থেকে আকাশের রহস্য ভেদ করবার নতুন একটা পথ পাওয়া গেল। ফরাসী বেলুনবিৎ এবং তাঁর সঙ্গী আমেরিকার ডাক্তার যেফ্‌রীজ্‌ বেলুনে ক'রে অনেক দূর পর্য্যন্ত উঠেছিলেন। সে কাহিনী আমরা আগেই বলেছি। তাঁরা দেখেছেন যে, যতই উপরে ওঠা যায় ততই বাতাস ঠাণ্ডা হ'তে থাকে আর শরীরে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ হয়। খুব উপরে উঠলে বাতাস খুব পাতলা হয়ে যায়, এই অস্বস্তিকর অবসাদের বোধ হয় সেই একটা কারণ। অনেকেই বেশী উপরে উঠতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন।

তারপরে বহুদিনের মধ্যে আর আকাশের উচ্চস্তরের খবর জানবার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন চেষ্টা হয় নি।

তারপরে আমরা চ'লে এলাম ১৮৬২ সালে। তখন বৃটিশ এসোসিয়েশন ফর এ্যাড্‌ভান্সমেণ্ট অব্‌ সায়ান্স এবং জেমস্‌ গ্লেসিয়ার একজন সঙ্গী নিয়ে নতুন ক'রে ঊর্দ্ধাকাশের তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। তাঁরা সাঁইত্রিশ হাজার ফুট পর্য্যন্ত উপরে উঠেছিলেন। তবে বৈজ্ঞানিকমণ্ডলী তাঁদের কথা নিঃসংশয়ে মেনে নেয় নি। কারণ বেলুন ঊনত্রিশ হাজার ফুট উপরে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা অজ্ঞান হয়ে যান। বেলুনটি তখনও মিনিটে হাজার মাইল বেগে উপরে উঠেছিল। তেরো

মিনিট তাঁরা অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। যখন তাঁদের জ্ঞান হ'ল তখন বেলুন প্রবল বেগে নীচের দিকে নামছে—মিনিটে দু'হাজার ফুট বেগে। এই থেকে তাঁরা হিসাব করে দেখেছেন যে, তাঁদের বেলুন অন্ততঃ সাঁইত্রিশ হাজার ফুট উঠেছিল। তাঁদের হিসাব নির্ভুল হলেও বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের কথা মেনে নেন নি। তবে অন্ততঃ ত্রিশ-বত্রিশ হাজার ফুট যে তাঁরা উঠেছিলেন তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

তাঁরা নানা রকম যন্ত্রের সাহায্যে আকাশের উচ্চস্তর সম্বন্ধে নানা রকম নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরা বিশেষ ক'রে লক্ষ্য করেছেন যে, যতই উপরে ওঠা যায় ততই বাতাস ঠাণ্ডা হ'তে থাকে আর নাড়ী অত্যন্ত চঞ্চল হয়। বুক যে ঢিপ-ঢিপ করে, নিজের কানেই সেই শব্দ শোনা যায়।

এরই তেরো বছর পরে ফরাসী বেলুনবিৎ টিসানডিয়ার দুজন সঙ্গী নিয়ে অনেক উঁচুতে উঠতে চেষ্টা করেন। প্রায় আটাশ হাজার ফুট উপরে উঠেও ছিলেন। কিন্তু সেখানকার পাতলা হাওয়ায় দম নিতে না পেরে তাঁর সঙ্গী দু'জন মারা যান।

এর পরেই মনে পড়ে ডাক্তার বার্সঁ সুরিংএর কথা। ১৯০১ সাল। বার্সঁ তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে বেলুনে উঠলেন। সাঁ-সাঁ ক'রে বেলুন উঠে যাচ্ছে। নীচের পৃথিবী ক্রমে ছায়ার মত মিলিয়ে আসছে। এ কি! তাঁদের শরীর এত অবসন্ন লাগছে কেন? ত্রিশ হাজার ফুট—বত্রিশ হাজার ফুট—ঠাণ্ডা, ভীষণ ঠাণ্ডা। বার্সঁ অক্সিজেন সিলিণ্ডারের ছিপি খুলে দিলেন।

তেত্রিশ হাজার—চৌত্রিশ হাজার ফুট—তাঁদের শরীর এলিয়ে আসছে। প্রবল ঘুমের আবেশে চোখ বুজে এল—আঃ বাইরে কি ঠাণ্ডা? তারপর আর তাঁদের মনে নেই। বেলুন তখনও উঠছে। হয়ত ছত্রিশ হাজার কি সাঁইত্রিশ হাজার ফুট উঠেছিল। সঠিক বলা শক্ত।

বহুদিনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সবার মনে একটা বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, যতই উপরে ওঠা যাবে তাপ ততই কমে আসতে থাকবে। তারপর হাজার হাজার ফুট উপরে শীতলতম স্তর পাওয়া যাবে—ঠাণ্ডার এই হ'ল শেষ সীমা। এর উপরে যতই ওঠা যাক, তাপ আর কমবে না। প্রতি এক হাজার ফুট উপরে উঠলে তাপ তিন ডিগ্রী ফারেনহিট ক'রে কমতে থাকে। যতই উপরে ওঠা যাবে ততই এই হিসাবে তাপ কমতে থাকবে। কিন্তু ফরাসী বৈজ্ঞানিক ডি রোর্ট দেখিয়াছেন যে, আসল ব্যাপার ঠিক তা নয়। থারমোমিটার বেঁধে হাজার হাজার ঘুড়ি তিনি আকাশে উড়িয়েছেন। তাতে তিনি দেখেছেন যে, প্রথম ছ-সাত মাইল উপর পর্য্যন্ত তাপ ক্রমেই কমতে থাকে, কিন্তু তারপর যতই ওঠা যাক, তাপ আর কমে না। তাহলেই দেখা গেল আকাশে ছ'-সাত মাইল উপরে একটা স্তর আছে। সমস্ত পৃথিবীকে সে চাঁদোয়ার মত ঘিরে রেখেছে। এই স্তরের নামকরণ করা হ'ল ষ্ট্র্যাটোস্ফীয়ার। আমাদের ঠিক মাথার উপরে পাঁচ-ছ মাইল উঁচু যে স্তর আছে, তার নাম হ'ল ট্রোপোস্ফীয়ার এবং ট্রোপোস্ফীয়ার ও ষ্ট্র্যাটোস্ফীয়ারের

মাঝখানে এক মাইল দেড় মাইল পুরু একটি স্তর—যার নাম ট্রোপেপজ্।

অনেকের মনেই এই প্রশ্ন উঠতে পারে—ষ্ট্র্যাটোস্ফীয়ারের কথা জেনে হবে কী? আমরা একে জানি না, তাই তুচ্ছ মনে হয়। অথচ এর আবিষ্কারের কাহিনী কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের চাইতে কিছুমাত্র কম রোমাঞ্চকর নয়। ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ার নানা ভাবে আমাদের পৃথিবীকে রক্ষা করছে। এ যদি না থাকত তবে শীত এবং গ্রীষ্ম এই দু'এরই অত্যাচারে আমরা মারা যেতাম। অসংখ্য উল্কায় আমাদের পৃথিবী ছেয়ে যেত। শুধু তাই নয় পণ্ডিতেরা দেখেছেন পৃথিবীর বাইরে থেকে সর্ব্বদা এক অদ্ভুত জাতের শক্তিশালী কণিকা বৃষ্টির মত আমাদের পৃথিবীর উপরে এসে পড়েছে। এর হাত থেকে যে আমরা রক্ষা পেয়ে যাচ্ছি তারও কারণ এই ষ্ট্র্যাটোস্ফীয়ার। এই স্তরে মেঘ নেই, বৃষ্টি নেই, কুয়াসা নেই; আছে প্রবল বাতাস—সেখানে অনবরতই ঝড় বইছে—ঘণ্টায় আটশ' মাইল কি হাজার মাইল বেগে।

যে অদ্ভুত শক্তিশালী রশ্মির কথা আমরা বলেছি তার নাম দেওয়া হয়েছে কস্‌মিক-রে বা মহা-জাগতিক রশ্মি। ১৯৩১ সালে সুইস্ প্রোফেসর ডাক্তার পিকার্ড কস্‌মিক-রে'র উৎসস্থল আবিষ্কারের জন্য আকাশে উঠেছিলেন। মস্ত বড় এক বেলুন আর তার সাথে দড়ি দিয়ে বাঁধা এলুমিনিয়ামের একটা গোলা। গোলার মুখ ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে দিলে বাইরের সঙ্গে ভিতরের আর কোন যোগই থাকে না। এই গোলার মধ্যে বসলেন

প্রোফেসর এবং তাঁর সহকর্ম্মী কিফার। সঙ্গে নানা রকমের যন্ত্রপাতি অক্সিজেনের সিলিণ্ডার। ২৭শে মে তারিখে যাত্রার একটু আগেই তাঁদের গোলাটা হঠাৎ সজোরে মাটিতে ঠুকে যায়; তার ফলে একটা অক্সিজেন সিলিণ্ডার একটু ফেটে যায়। তাতে ক্ষতি কিছু হয় নি। অথচ প্রোফেসরের এই নিয়ে দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। জার্ম্মাণীর অগস্‌বুর্গ থেকে যাত্রা সুরু হ'ল এবং পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই বেলুন উনপঞ্চাশ হাজার ফুট উপরে উঠে গেল। এই প্রচণ্ড গতির ফলে যন্ত্রপাতি সব থরথর ক'রে কাঁপতে আরম্ভ করল--কয়েকটা যন্ত্র নষ্টই হয়ে গেল।

বেলুন আরও উঠতে লাগল। শেষটায় প্রায় পৌনে দশ মাইল ওঠার পর তাঁরা প্রবল বাতাসের মুখে পড়েন। বেলুন বহুদূর ভেসে চলল বাতাসের বেগে। সন্ধ্যার দিকে অট্‌স্‌-ওয়াল্ডটিরল অঞ্চলে বেলুন এসে এক বরফের স্তূপের উপর নামল। কয়েকজন চাষী সেখান থেকে তাঁদের উদ্ধার করে।

পরের বছর অগাষ্ট মাসে প্রোফেসর পিকার্ড ডাক্তার ম্যাক্স কসিন্‌কে সঙ্গী নিয়ে আর একবার বেলুনে যাত্রা করেন। এবারে তাঁরা প্রায় সাড়ে দশ মাইল উপরে উঠেছিলেন। দু'-বারেই প্রোফেসর দেখিয়ে দিলেন যে, ষ্ট্র্যাটোস্ফীয়ারের ভিতরে গিয়েও নির্ব্বিঘ্নে ফিরে আসা অসম্ভব। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য তিনি যে দুঃসাহসিকের মত বেলুনে উঠেছিলেন অনেকেই সেজন্য তাঁকে প্রশংসা করতে লাগলেন। কিন্তু পিকার্ড ছিলেন সত্যিকারের বিজ্ঞানের সাধক। তাই তিনি শুধু মৃদু হেসে বললেন—"এর

ভিতরে দুঃসাহসের' কিছু নেই। এ তো শুধু রুটিন মাফিক কাজ!" প্রোফেসর বেলুনে ক'রে অত উঁচুতে উঠেছিলেন, কিন্তু এরোপ্লেন সম্বন্ধে ছিল তাঁর অদ্ভুত রকমের ভয়। তাঁর ধারণা ছিল এরোপ্লেনের ওঠার মত বিপদ আর কিছু নেই।

পিকার্ডের দেখাদেখি তার পরের বছরই দু'জন সোভিয়েট বৈজ্ঞানিক বেলুনে ক'রে বারো মাইল উপরে উঠেছিলন। এরই দু'মাসের ভিতর আমেরিকার সমর বিভাগ থেকে ঊর্দ্ধলোকের রহস্য সন্ধানে এক বেলুন পাঠানো হয়। এই বেলুনে ছিলেন লেফ্‌টেনাণ্ট কমাণ্ডার সেট্‌ল এবং তাঁর সহযোগী মেজর ফোর্ডনী। তাঁরা সাড়ে এগারো মাইলের বেশী উঠতে পারেন নি। নামবার সময়ে বেলুন একটা জলাভূমির উপরে গিয়ে পড়ল। একে জলা জায়গা, তার উপর আবার রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। তাই তাঁরা বেলুনের কাপড় মুড়ি দিয়েই কোনমতে শীতে কাঁপতে কাঁপতে রাত কাটালেন। ভোরবেলা সাঁতরে তীরে ওঠেন। বেলুনটা অবশ্য একেবারেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ভিতরকার যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য কোন জিনিষই নষ্ট হয় নি। তাঁরা এই সব জিনিষ প্রোফেসর মিলিকানের হাতে দিলেন। কস্‌মিক রশ্মি সম্বন্ধে তাঁর মতই ছিল প্রামাণ্য।

১৯৩৪ সালে সোভিয়েট রাশিয়া এক যুগান্তকারী বেলুন অভিযান করে। বিরাট বেলুন—নাম ছিল 'ও সোভিয়েট্‌ কিম্‌'। সাড়ে তেরো মাইলেরও বেশী উপরে সে উঠেছিল। কিন্তু নামবার সময়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

এই বেলুনের ভিতরে বেতার যন্ত্র ছিল। নামবার সময় তাঁরা খবর পাঠালেন—অবস্থা মোটামুটি ভাল। চারদিকে বিশেষ কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমরা যে কোথায় রয়েছি তাও ঠিক ক'রে বলতে পারছি না।

মাটির উপরে যাঁরা এই খবর শুনছিলেন তাঁরা একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কিন্তু একটু পরেই তাঁরা যে খবর পেলেন তাতে তাঁদের অন্তর আশঙ্কায় হিম হয়ে গেল।

বেতারে খবর এল—"বেলুন থেকে বলছি—মারাত্মক অবস্থা ...বেলুনের উপর বরফ জমেছে—আর কোন আশা নেই—আমরা প'ড়ে যাচ্ছি—নীচে, আরো নীচে—আমাদের গায়ের উপর বরফ জমতে সুরু করেছে—ভগবান রক্ষা করুন—দু'জন সঙ্গীর অবস্থা মারাত্মক—গেল গেল—"

আকাশের উর্দ্ধলোকে উঠবার জন্য শুধু যে বেলুনই ব্যবহার করা হয়েছে এমন নয়—এরোপ্লেনকেও এই কাজে লাগান হয়েছে। তবে বেলুনের তুলনায় এরোপ্লেনের সাফল্য অনেক—অনেক কম। এরোপ্লেনের সাহায্যে আকাশের খুব উঁচু স্তরে উঠবার বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে ১৯২৭ সাল থেকে। ঐ বছরই আমেরিকান বৈমানিক লেফ্‌টেনাণ্ট চ্যাম্পিয়ন প্লেনের সাহায্যে প্রায় চল্লিশ হাজার ফুট উপরে উঠেছিলেন। এর তিন বছর যেতে না যেতেই আর একজন আমেরিকান বৈমানিক লেফ্‌টেনাণ্ট সুসেক তেতাল্লিশ হাজার ফুট উপরে উঠে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। এদিকে পিকার্ড তখন বেলুনে উঠে

উর্দ্ধাকাশের রেকর্ড করেছেন। এরোপ্লেনই বা পিছনে প'ড়ে থাকবে কেন? একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক গুস্টভ্ লেমোয়াঁ এরোপ্লেনে ক'রে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার ফুট উঠলেন। কিন্তু তখন তাঁর ইঞ্জিনে গোলমাল আরম্ভ হয়। তিনি প্যারাস্যুট কাঁধে নিয়ে লাফ দিয়ে পড়লেন। কিন্তু প্যারাস্যুটটি সময়মত খুলল না। তারপরে কি হ'ল সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

এরোপ্লেনে রেকর্ড করবার দিক দিয়ে ১৯৩৪ সালটি খুবই স্মরণীয়। একজন ইটালীয় কমাণ্ডার ৪৭,৩৫২ ফুট উঠলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে উইলীপোষ্ট তাঁর গৌরব ম্লান ক'রে দিয়ে 'উইনিমে'তে ক'রে ৪৮,০০০ ফুট উঠে গেলেন। কিন্তু উচ্চতা-জ্ঞাপক যন্ত্র খারাপ থাকায় পোষ্টের কথা কেউ মেনে নেয় নি। তাই রেকর্ড ইটালীরই রইল।

দু' বছর চুপচাপ। ১৯৩৬ সালে এক ফরাসী বৈমানিক নতুন রেকর্ড করলেন। তিনি উঠেছিলেন ৪৮,৭০০ ফুট পর্য্যন্ত কিন্তু তাঁদের এ গৌরব দেড় মাসও রইল না। রয়্যাল এয়ার ফোর্সের স্কোয়াড্রন লীডার সোয়েন ৪৯,৯০০ ফুট উড়ে নতুন রেকর্ড স্থাপন করলেন।

১৯৩৭ সালে ইটালী সব রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়ে প্রায় সাড়ে একান্ন হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠলেন। কিন্তু ইংরাজ অধ্যবসায়ী জাত। হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাকবার লোক তাঁরা নন। তাই অল্প দিনের মধ্যেই ফ্লাইট লেফ্টেনাণ্ট ৫৩,৯৩৭ ফুট উঠে সবার উপরে টেক্কা দিলেন। এরোপ্লেনের এইই হ'ল শেষ

রেকর্ড—সওয়া দশ মাইল। এ্যাডাম যে শুধু উপরেই উঠেছেন তা নয়, এই উপলক্ষে তিনি আকাশের উচ্চস্তর সম্বন্ধে নানা রকম বৈজ্ঞানিক তথ্যও সংগ্রহ করেছিলেন।

উপরে খুব বড় একটা অসুবিধা হ'ল নিশ্বাস নেওয়ার কষ্ট। সেখানে বাতাস এত পাতলা যে, স্বাভাবিক ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রায় অসম্ভবই। তাই অক্সিজেন নেবার বন্দোবস্ত করতে হয়।

ষ্ট্র্যাটোস্ফীয়ার ভ্রমণের আর একটা মারাত্মক অসুবিধা হ'ল সেখানকার প্রচণ্ড শীত। সেইজন্য চারদিক-ঢাকা বিশেষ ধরণের প্লেন তৈরী করতে হয়। তা ছাড়া যাত্রীদেরও উপযুক্ত শীত-বস্ত্রের নিতান্ত প্রয়োজন।

এই ভ্রমণের জন্য কিন্তু যে কোন প্লেনই চলবে না। আমরা যেমন সাঁতার কাটবার সময়ে জল কেটে সামনে অগ্রসর হই, এরোপ্লেনও তেমনি বাতাস কেটে সামনে এগোয়। কিন্তু যতই উপরে ওঠা যাবে বাতাস হবে ততই পাতলা। তাই সাধারণ প্রোপেলারে সেখানে ভাল কাজ দেবে না। সেজন্য চাই নতুন ধরণের প্রোপেলার।

ষ্ট্র্যাটোস্ফীয়ারে একটা সুবিধা হ'ল সেখানে প্রায় সব সময়ে প্রবল বেগে বাতাস বয়। এই ঝড় প্লেন চালনায় বিশেষ সাহায্য করতে পারে ব'লে বৈমানিকদের বিশ্বাস। তাঁরা মনে করেন যে, ষ্ট্র্যাটোস্ফীয়ার দিয়ে অনায়াসেই হাজার মাইল বেগে এরোপ্লেন চালান যেতে পারে। তবে সেজন্য এরোপ্লেনও একটু বিশেষ ধরণের করতে হবে, যাতে বাতাসের বাধা খুব বেশী না
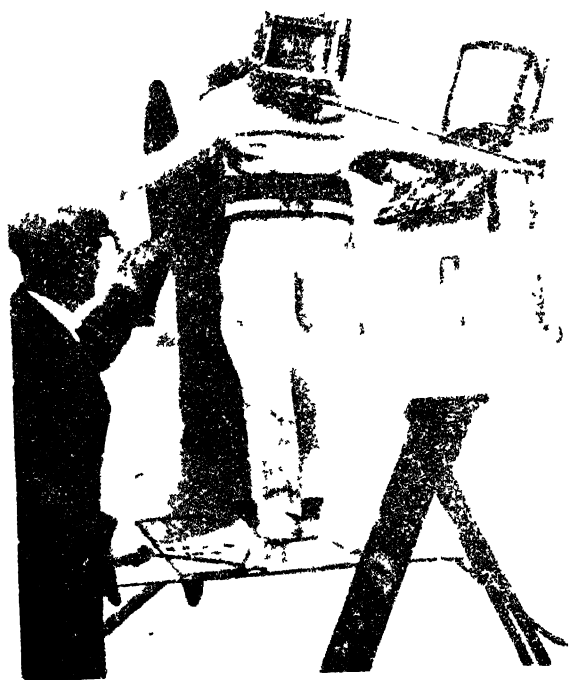
হয়। ষ্ট্র্যাটোস্ফীয়ারে বিমান চালনা সম্ভব হলে কিন্তু মানুষের বিপদ বাড়বে বই কমবে না। তখন অতি দ্রুত এক দেশ থেকে আর এক দেশে এসে বোমা ফেলে যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের ব্যাপার হবে না। শুধু তাই নয়, শত্রুর হাত থেকে আমাদের দেশ যত দূরেই হোক না কেন, ষ্ট্র্যাটোস্ফীয়ারে বিমান চালনার ফলে আমাদের দেশও আর দূর পাল্লার পথ থাকবে না। দূর আর দূর মনে হবে না।

মানুষের দুঃসাহসের সীমা নেই। তার একদিকে যেমন ইচ্ছা ছিল পাখীর মত আকাশে অবাধে ভেসে বেড়াবে তেমনি তার কল্পনা ছিল গ্রহে-গ্রহে নক্ষত্রে-নক্ষত্রে ভ্রমণ করবে। এজন্য চেষ্টাও সে কম করে নি। মহাশূন্যে ভেসে বেড়ানোর জন্য সে আবিষ্কার করেছে 'রকেট'। এই যন্ত্র অবশ্য এখনও এর শৈশবই পার হয় নি। তবু এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। যেদিন রাইট ভ্রাতৃদ্বয় প্রথম মাত্র বারো সেকেণ্ড আকাশে উড়েছিলেন তখন কে ভাবতে পেরেছিল যে, এই এরোপ্লেনের সাহায্যেই একদিন একটানা হাজার হাজার মাইল পাড়ি দেওয়া চলবে? তাই রকেট সম্বন্ধেও হতাশ হবার কিছুমাত্র কারণ নেই। একদিন না একদিন সে মহাবিশ্বের সন্ধানে বেরুতে পারবেই। রকেটের সঙ্গে সাধারণ রেল বা মোটর গাড়ীর পার্থক্যই হ'ল যে, এতে কোন রকম ইঞ্জিনেরই দরকার হয় না। যাঁরা বন্দুক ছোড়েন তাঁরা দেখেছেন ঘোড়া টিপবার সাথে সাথে বারুদে আগুন লেগে যায়, প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণের ফলে একদিকে

যেমন গুলিটা সামনের দিকে ছুটে যায়, বন্দুকটা তেমনি একটু পিছনের দিকে স'রে আসে। একে বলা হয় Recoil বা প্রতিক্রিয়া। বন্দুকটা যদি ধরা না থাকত তবে সে পিছনের দিকে ছুটে যেত খানিকটা। এখানে গুলিটা বড় কথা নয়, বিস্ফোরণটা আসল কথা। রকেটের মূল তথ্যই হ'ল এই বিস্ফোরণ। রকেটের পিছনের দিকে দাহ্য পদার্থ সাজান থাকে। তাতে বিস্ফোরণ হলেই রকেট সামনের দিকে ছুটে যাবে প্রচণ্ড গতিতে। এরোপ্লেনের মত পাখার সাহায্যে একে বাতাস কেটে যেতে হয় না ব'লেই, মহাশূন্যে যেখানে বাতাস নেই সেখানেও যেতে এর সত্যিকারের বাধা কিছু নেই। এমন কি বাতাসের ভিতর দিয়ে রকেটের চলতেই বরং অসুবিধা।

বেলুন বা এরোপ্লেনের আবিষ্কার হয়েছে মাত্র সেদিন। রকেটের কথা মানুষ চিন্তা করেছে হাজার হাজার বছর থেকে। শোনা যায় চীনাবাসীরা নাকি হাজার বছর আগেও রকেটের ব্যবহার জানত। তা'রা তীরের সঙ্গে রকেট জুড়ে শত্রুর বিরুদ্ধে ছুড়ত। এমন কি, পঞ্চদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডীয়েরাও ভাবতে সুরু করেছিল, রকেটকে যুদ্ধের কোন কাজে লাগান যেতে পারে কিনা। নেপোলিয়ন যখন ইংলণ্ড আক্রমণ করবার পরিকল্পনা করেন তখন ইংলণ্ডবাসীরা বোমারু হিসাবে কতগুলো রকেট তৈরী করেছিল। তবে সে সব হ'ল অতি প্রাথমিক যুদ্ধের কথা।

রাশিয়ানরা বরাবরই রকেট সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহশীল।

এরোপ্লেন তখন সবে আবিষ্কার হয়েছে। সেই সময়েই রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক জিয়োকোস্‌কী রকেটের সাহায্যে কী ক'রে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাওয়া যেতে পারে তাই নিয়ে আলোচনামূলক একখানা বই লেখেন। এই বইএর মধ্যে অবশ্য কল্পনার স্থান ছিল যথেষ্ট। তাই একে বিশেষ মর্য্যাদা কেউ দেয় নি। কিন্তু গত মহাযুদ্ধ শেষ হবার পরেই আমেরিকান প্রোফেসর গডার্ড তাঁর রকেট সম্বন্ধীয় পরীক্ষার ফলাফল লিপিবদ্ধ ক'রে একখানা বই লেখেন। বইখানাকে সবাই সাগ্রহে গ্রহণ করল। এদিকে ১৯২৩ সালে অষ্ট্রিয়ান প্রোফেসর হারম্যান ওবার্থও রকেট নিয়ে নানারকম গবেষণা করেছিলেন। এর চার বছর পরেই তাঁর জার্ম্মাণ ছাত্র ম্যাক্স ভ্যালিয়ার জার্ম্মাণীতে আন্তর্গ্রহ সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির একজন খুব উৎসাহী সভ্য ছিলেন ফন্ ওপেল—মস্তবড় মোটর-কারখানার মালিক। বিভিন্ন রকমের গাড়ীতে রকেট জুড়ে দিলে কেমন হয় তাই নিয়ে তিনি পরীক্ষা সুরু করলেন। প্রথমে মোটর গাড়ী, পরে রেল, তারপর স্লেজ, কিছুই বাদ গেল না। ভ্যালিয়ার রকেটের সাহায্যে বরফের উপর দিয়ে ঘণ্টায় আড়াই'শ মাইল বেগে স্লেজগাড়ী চালিয়েছেন। কিন্তু এর কিছুদিন পরেই রকেট-চালিত মোটর গাড়ী চালাতে গিয়েই তিনি মারা যান।

তাঁর মৃত্যুতে একটা জিনিষ বিশেষ ক'রে প্রমাণিত হ'ল যে, রকেট-গাড়ীকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত না করতে পারলে সে মৃত্যু ঘটাতে পারে। আরও দেখা গেছে মাটির উপরে রকেট-চালিত

গাড়ীর চাইতে সাধারণ ইঞ্জিনে টানা গাড়ীই বেশী উপযোগী, তবে মহাশূন্যে রকেটই একমাত্র সম্বল।

বৈজ্ঞানিকেরা আরও একটা জিনিষ লক্ষ্য করলেন। এতকাল বিস্ফোরণের জন্য বারুদ জাতীয় শক্ত জিনিষই ব্যবহার করা হ'ত। এবারে দেখা গেল তরল-অক্সিজেন জাতীয় তরল জিনিষই বিস্ফোরক হিসাবে ব্যবহার করা ভাল।

জার্ম্মাণ সমিতি প্রথমেই ব'ড় বড় তিনখানা রকেট নির্ম্মাণের কাজে হাত দিলেন। প্রথম দুখানা তৈরীর সময়েই নষ্ট হয়ে গেল। তৃতীয়খানা (তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'রিপাল্‌সড রকেট ১নং') যখন তৈরী হ'ল বৈজ্ঞানিকেরা বুঝতে পারলেন যে, তাঁরা ঠিক পথেই চলেছেন। এরই কতগুলো উন্নতি করতে পারলেই কার্য্যসিদ্ধি।

এদিকে ফরাসীরা চুপ ক'রে বসেছিল না। প্রোফেসর পেল্‌টারি একজন ধনী মহাজনের সাহায্যে রকেট তৈরীর কাজে লেগে গেলেন।

দেখতে দেখতে—১৯৩০ সালের মধ্যেই বিভিন্ন দেশে আন্তর্গ্রহ-সমিতি স্থাপিত হ'ল। হ'ল না শুধু ইংলণ্ডে। কোন রকম নতুন জিনিষই তাঁরা সহজে গ্রহণ করতে চান না। রাইট ভাইএরা যখন তাঁদের পেটেন্ট বেচবার জন্যে ইংরাজের কাছে এলেন, তখন তাঁরা অত্যন্ত উদাসীন ভাবেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তাঁদের অসীম বিশ্বাস ছিল নৌবহরের উপর। এরোপ্লেন আর নৌবহরের কতটুকুই বা সাহায্য করতে পারবে!

এরোপ্লেনের ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা সেদিন তাঁরা ভাবেন নি। অবশ্য বহু চেষ্টার পরে ১৯৩৩ সালে লণ্ডনেও এই সমিতি স্থাপিত হয়। কিন্তু সরকারী অনুগ্রহের অভাবে এর অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়।

রকেটে ক'রে পৃথিবী ছেড়ে অন্য গ্রহে যাবার কতগুলো মারাত্মক অসুবিধা আছে। আমরা শুধু সংক্ষেপে সেগুলোর কথা বলব।

প্রথমেই মনে পড়ে পৃথিবীর টানের কথা। ছোট বড় সব জিনিষকেই মাটি তার বুকের দিকে টানছে। তাই সব জিনিষই ছেড়ে দিলে মাটিতে প'ড়ে যায়। এই রকেট তা'হলে পৃথিবীর টান এড়িয়ে অন্য গ্রহে যাবে কি ক'রে? বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব ক'রে দেখেছেন যে, রকেটকে যদি ঘণ্টায় পঁচিশ হাজার মাইল বেগে চালান যায় তবে সে পৃথিবীর মায়া কাটাতে পারবে। কিন্তু এইখানেই আরও একটা কথা এসে পড়ে। অতি প্রচণ্ড গতি সম্ভব হবে কি ক'রে? এখানেও বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন যে, বারুদের বদলে তরল ইন্ধন ব্যবহার করলে এই গতি লাভ করা অসম্ভব নয়। তবে এখানে আরও একটা কথা ভাববার আছে। হঠাৎ এত প্রচণ্ড গতিতে চলতে আরম্ভ করলে রকেটের ভিতরকার আরোহীরা কেউই বাঁচতে পারবে না। তবে? এই বাধা কাটিয়েছেন একজন জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক। তিনি হিসাব ক'রে দেখেছেন যে, রকেটের পঁচিশ হাজার মাইল গতি আয়ত্ত করতে যদি আট মিনিট সময় লাগে তবে আরোহীদের ভয়ের

কোনই কারণ নেই। সেই জন্য একটু একটু ক'রে গতি-বেগ বাড়ানোর কৌশলও বিজ্ঞানবিদেরা ভেবে রেখেছেন।

দ্বিতীয়তঃ আসে সূর্য্যরশ্মির কথা। যতই উপরে ওঠা যাবে ততই ঠাণ্ডা। তা'ছাড়া সূর্য্য থেকে হয়ত নানা রকমের রশ্মি ছড়িয়ে পড়ছে। আমাদের সবার উপরে বাতাস আছে ব'লে আমরা হয়ত তাদেব অস্তিত্বের কথা বুঝতে পারি না। কিন্তু মহাশূন্যে, যেখানে বাতাস নেই, সেখানে হয়ত এই সব বশ্মি মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। পণ্ডিতেরা কিন্তু এই বিষয়টার উপর খুব গুরুত্ব দেন নি। তাঁরা বলেন, উপরে নানা রকমের রশ্মি থাকতে পারে বটে, তাদের ব্যবস্থা করাও অসম্ভব হবে না। আর তা'রা যে আরোহীদের পক্ষে খারাপই হবে এমনও ত প্রমাণ হয় নি। তবে অত্যন্ত ঠাণ্ডার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে বৈ কি! দু'পাল্লা কাচের আবরণ দিয়ে যেমন থার্ম্মোফ্লাস্ক তৈরী হয় রকেটেও সেই ধরণের কোন বন্দোবস্ত করতে হবে।

তৃতীয়তঃ অনেকে সন্ধেহ করেন যে, উপরে উঠলে অসংখ্য উল্কার আঘাতে মৃত্যু নিশ্চয়। সন্দেহটা ঠিক নয়। উল্কা অসংখ্য রয়েছে সে কথা ঠিক। তবে অসীম শূন্যের মধ্যে তা'রা যে এসে রকেটের গায়ে লাগবে সে সম্ভাবনা খুবই কম। তবে যদি লাগে তা'হলে মৃত্যু নিশ্চয়। কিন্তু বিজ্ঞানের জন্য কত লোকেই আত্মোৎসর্গ করেছেন। তাই এতে বৈজ্ঞানিকেরা ভীত নন।

আমাদের গ্রহের টান ছাড়িয়ে যেই রকেট দূরে চ'লে যাবে অমনি সঙ্গে সঙ্গে ভার-বোধও থাকবে না। কারণ পৃথিবী বা
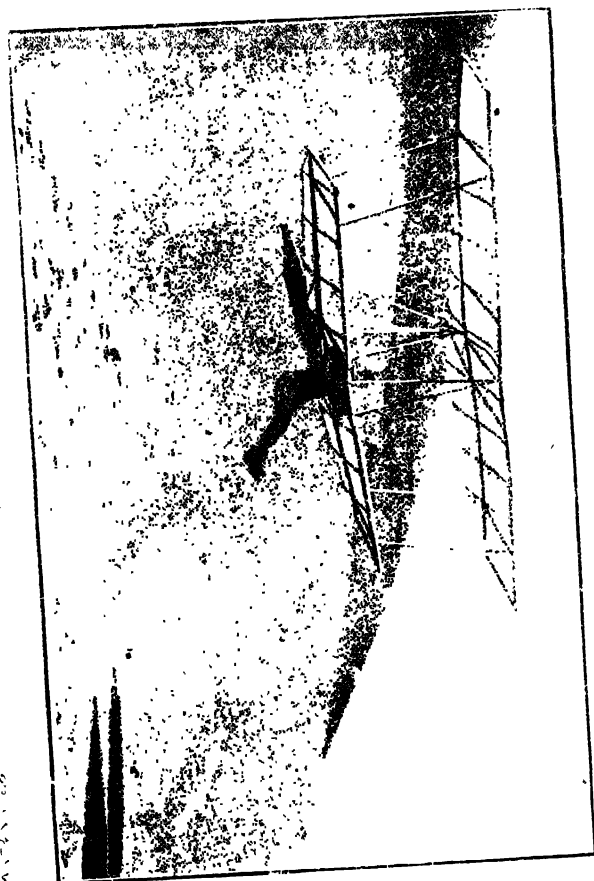
অন্য কেউ ত আর তখন তাকে টানবে না। এ একটা আশ্চর্য্য অনুভূতি। মানুষ এই অনুভূতিকে কেমন ক'রে গ্রহণ করবে সেকথা বলা শক্ত।

সব চাইতে মারাত্মক ব্যাপার হবে, রকেট যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়! হয়ত অখণ্ডকাল ধ'রে সে মহাশূন্যে ঘুরে বেড়াবে। হয়ত বা কোন গ্রহের টানে প'ড়ে হতভাগ্য চাঁদের মত দিনের পর দিন তাকে প্রদক্ষিণ করতে হবে। হয়ত ভ্রমণেব প্রচণ্ড বেগে সব তাল-গোল পাকিয়ে যাবে। অনেক কিছুই হতে পারে—কে জানে?

এসব এখন পর্য্যন্ত কল্পনা বটে, তবে অলস কল্পনা নয়। অবশ্য মাটির দেশে রকেট চলাচল আরম্ভ হয়ে গেল ব'লে। রকেটের সাহায্যে বিভিন্ন সহরে ডাক বিলি করবার বন্দোবস্ত হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই হয়ত রকেটের সাহায্যে আটলান্টিক পারাপার চলবে। কে জানে কবে সেই দিন আসবে? তবে আসবে, একথা ঠিক।

এই সঙ্গে গ্লাইডারের কথা না বল্‌লে বিমান-বিহারেব কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। গ্লাইডার আর কিছুই নয়—ইঞ্জিনবিহীন এরোপ্লেন। দেহটা কাঠের তৈরী, তাই খুব হাল্‌কা। মাল বইতে পারে অনেক। দশ-পনেরো জন লোক, মাঝারি সাইজের একটা ট্যাঙ্ক, এই রকম আরও অনেক কিছুই একটা গ্লাইডার বহন করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল—ইঞ্জিন নেই তবে গ্লাইডার চলে কি ক'রে? একখানা এরোপ্লেন গ্লাইডারটিকে শূন্যপথে টেনে নিয়ে যায়। তারপর যখন সে যথেষ্ট গতি সঞ্চয়

করে তখন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। চালক ষ্টীয়ারিং ঘুরিয়ে ইচ্ছামত নামতে পারে। আকাশে ছেড়ে দেবার পরেও গ্লাইডার অন্ততঃ ত্রিশ-চল্লিশ মাইল ভেসে যেতে পারে। গ্লাইডারের মস্ত একটা সুবিধা হ'ল যে সে অত্যন্ত নিঃশব্দে নামতে পারে।

প্রথম সাফল্যের সঙ্গে গ্লাইডার ব্যবহার করেন জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক লিলিএন্থাল। কিন্তু এই প্রচেষ্টার ফলেই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়। লিলিএন্থালের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে রাইট-ভ্রাতৃদ্বয় গ্লাইডার নির্ম্মাণের কাজে মন দেন। কিন্তু তার পর থেকে গ্লাইডার সম্বন্ধে বহুদিনের মধ্যে আরও কিছু শোনা যায় নি। নতুন ক'রে এর উদ্ভব হয় গত মহাযুদ্ধের পরে জার্ম্মাণীতে। যুদ্ধের পর সম্মিলিত জাতিগুলো জার্ম্মাণীর অস্ত্রশস্ত্র ও বিমানবহরের উপর অত্যন্ত কড়া রকমের বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। ফলে জার্ম্মাণীতে কিছু দিনের মত বিমান তৈরী এক রকম বন্ধই হয়ে গেল। কিন্তু জার্ম্মাণরা চুপ ক'রে ব'সে থাকবার পাত্র নয়। যুদ্ধের পর তাদের অনেক পাইলট বিমানের অভাবে বেকার হয়ে পড়েছিল। তা'রা এবার গ্লাইডার চালনায় মন দিল। ক্রমাগত চেষ্টার ফলে কেউ কেউ তিনশ' চারশ' মাইল পর্য্যন্ত উড়তে পারতেন। এই থেকেই জার্ম্মাণীতে গ্লাইডারের উন্নতি আরম্ভ হ'ল। অন্যান্য দেশ যখন গ্লাইডারের কথা ভাবতেও পারেন নি জার্ম্মাণী তখন গ্লাইডারের অনেক উন্নতি করেছে। হিটলার ক্ষমতা পাবার পরে গোয়েরিং এক গ্লাইডার বাহিনী গঠন করেন। ক্রীটের যুদ্ধে জার্ম্মাণী তার গ্লাইডারের উৎকর্ষ

আধুনিক গ্লাইডার পৃ. ১১৫-১৬
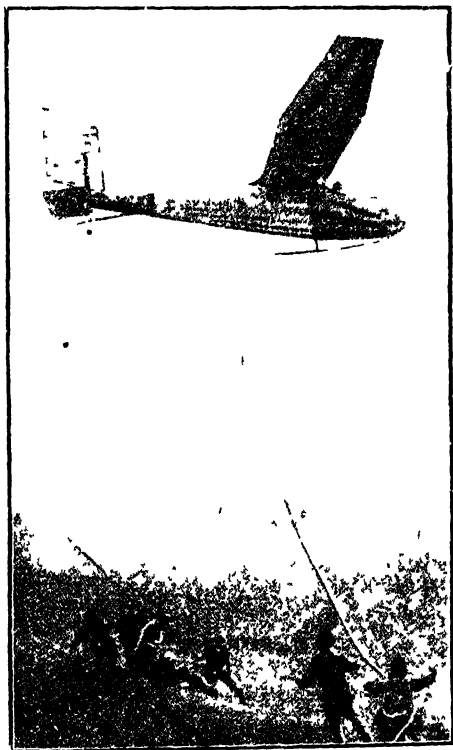
দেখিয়েছে। তার পর থেকেই অন্যান্য দেশের চোখ খুলে যায়। বর্ত্তমানে আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে গ্লাইডার তৈরী হচ্ছে।

মানুষের আকাশ-জয়ের কথা আমরা মোটামুটি বলেছি। ভারতবর্ষ এবিষয়ে এখনও অনেক পিছনে প'ড়ে আছে। অবশ্য কিছুকাল যাবং বিভিন্ন বিমান ঘাঁটিতে ফ্লাইং ক্লাব খোলা হয়েছে। তাতে কিছু কিছু ভারতীয় বিমান চালনা শিক্ষা করছেন। বাঙ্গালীদের ভিতরে যাঁরা প্রথম প্রথম বিমান-চালনায় খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে বিনয়কৃষ্ণ দাস এবং ভবদেব মুখোপাধ্যায়ের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিষ্টার দাস বিমান-দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁর নামে একটা বিমান-বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মিষ্টার দাস তাঁর বিমান-বিহারের কাহিনী নিয়মিত ভাবে মাসিক কাগজে লিখতেন। তাঁরা দেশের গৌরব এবং আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্যান্য যে কোন সভ্য দেশের তুলনায় বিমান-বিজ্ঞানে আমরা যথেষ্ট পিছনে প'ড়ে আছি। পরাধীন দেশের নানা অসুবিধার ভিতর দিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে বিমানের অশেষ উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সব খবর আমাদের ঘরে এসে পৌঁছায় নি। যুদ্ধের পর পৃথিবী শান্ত হলে বিমান-জগতে এক যুগান্তকারী অধ্যায় আরম্ভ হবে। সেই দিনে আমাদের পিছিয়ে পড়লে চলবে না। কালের সঙ্গে তাল রেখে অগ্রসর হ'তে হবে। আমরা সেই অনাগত দিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

সর্ব্বগ্রাসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আজ শেষ হয়েছে। এই যুদ্ধ একদিকে যেমন দিকে দিকে ধ্বংসের বীজ ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি অন্যদিকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি হয়েছে প্রচুর। বিমান-জগতের উন্নতি হয়েছে যথেষ্ট। যুদ্ধকালীন গোপনীয়তার জন্য তার অনেক কথাই আমরা জানতে পারিনি; আজ যদিও যুদ্ধ শেষ হয়েছে, তা'হলেও সব তথ্য এখনও প্রকাশ পায় নি।

যুদ্ধকালীন গবেষণার ফলে সব চাইতে উন্নতি হয়েছে রকেট প্লেন এবং চালক-বিহীন বিমানের। এরা ত্ব'টিই বর্ত্তমান জগতের বিস্ময়। যুদ্ধের আগেও রকেট প্লেন ছিল এবং তা' নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের আশার অন্ত ছিল না। কিন্তু আজ যে ধরণের রকেট প্লেন আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে মনে হয় আর দশ বছরের মধ্যেই আমরা পৃথিবী থেকে চন্দ্রলোকে বা অন্য কোন গ্রহে যাত্রা করতে পারব।

সাধারণ এরোপ্লেন বাতাস কেটে অগ্রসর হয়, আমরা যেমন জল কেটে সাঁতার দিই। এর সুবিধা এবং অসুবিধা তুই-ই আছে। সুবিধা হ'ল এই যে, বাতাস আছে বলেই প্লেন বাতাসের গায়ে ধাক্কা মেরে এগিয়ে যেতে পারে,—ভেসে থাকতে পারে। বাতাস না থাকলে এরোপ্লেন আকাশে উঠ্‌তেই পারত না। কিন্তু বাতাস থাকায় অসুবিধাও অছে। প্লেন যত তাড়াতাড়ি চলবে বাতাসের ঘষায় ঘষায় তার গা তত গরম হয়ে উঠবে। বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব ক'রে দেখেছেন যে ৭৫০ থেকে ১৫০০ মাইল বেগ পর্য্যন্ত এরোপ্লেন সহ্য করতে পারে। তার